তক্ষশীলায় তৎকালে কৌটিল্য চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণ যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমান তেমনি অসাধারণ কুচক্রী ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় সম্বন্ধে একটী চমৎকার প্রবাদ আছে। একদা চাণক্য স্নান করিতে যাইতেছিলেন, পথে একটী কুশাঙ্কুর তাঁহার চরণে বিদ্ধ হয়। ইহাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেশের সমস্ত কুশ নির্ম্মূল না করিয়া স্নান আহার করিবেন না। সুতরাং তদ্দণ্ডেই কুশ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিয়া সে স্থানকে কুশশূন্য করিলেন। ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। পাছে আবার অঙ্কুর হয়, এই আশঙ্কায় প্রতি কুশমূলে শর্করা ছড়াইয়া পিপীলিকা দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমূলে কুশ নির্ম্মূল করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন যে, নন্দ বংশ নির্ম্মূল করিবার জন্য এমনই একজন লোকেরই প্রয়োজন বটে। সুতরাং চাণক্যের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহাকে পাটলীপুত্র নগরে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহারই অসামান্য বুদ্ধিবলে নন্দবংশধ্বংশ করিলেন।

পাটলীপুত্রনগরে আসিয়া চাণক্য প্রথমে নন্দরাজার সহিত কোন সূত্রে বিবাদ করেন। তাহাতে রাজা তাঁহার অবমাননা করায় চাণক্য শিখা খুলিয়া সভামধ্যে প্রতীজ্ঞা করিয়া বলিলেন "চাণক্য এই যে শিখা খুলিল নন্দবংশ উৎসন্ন না দিয়া আর বাঁধিবে না।" বস্তুত নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তবে ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কি উপায়ে নন্দরাজ-মন্ত্রী রাক্ষসের সমস্ত মন্ত্রণা বিফল করিয়া অবশেষে এই কার্য্য সম্পন্ন করেন, মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাটকে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ঐ নাটকে পাটলীপুত্রের নাম কুসুমপুর দেখা যায়।

এ দিকে মহাবীর আলেকজাণ্ডার পঞ্জাবে পুরুরাজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া গ্রীশ দেশে ফিরিয়া যাইতে পথিমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার বিজীত রাজ্য-সমস্ত তাঁহার সেনাপতিরা বিভাগ করিয়া লইল। ভারতবর্ষভাগ সেলুকাস্ নিকেটরের অংশে পড়িল। সেলুকাসের রাজ্য খ্রীঃ পূর্ব্ব ৩১২ অব্দে আরম্ভ হয়। তিনি আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। বীরবর সেকেন্দর যাহা করিতে পারেন নাই সেলুকাস তাহা করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন। ভারত জয়ের আশায় তিনি সিন্ধুনদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পুরুরাজ অপেক্ষা এক প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইল। সে শত্রু, চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া অগণ্য হয়, হস্তী ও পদাতী লইয়া নিকেটরের গতিরোধ করিলেন। এই বিষম ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া নিকেটর তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন। সন্ধি স্থাপন হইলে চন্দ্রগুপ্ত নিকেটরকে৫০০ হস্তী প্রদান করেন। নিকেটর তদ্বিনিময়ে সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থিত সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে আপনার এক কন্যাও প্রদান করেন। হিন্দুরা গ্রীকদিগকে যবন বলিত -- হিন্দু হইয়া চন্দ্রগুপ্ত কি প্রকারে যবনকন্যা গ্রহণ করিলেন তাহা বলা যায় না। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তর সহিত মিত্রতা দৃঢ় রাখিবার জন্য, স্বদেশ গমনকালে, মেগাস্থেনিস

নামক একজন সুপণ্ডিত দূতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। এই মেগাস্থেনিস পাটলীপুত্রে অবস্থিতিকালে মগধরাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আজকাল ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিয়া থাকেন। মেগাস্থেনিস গ্রীকভাষায় তৎকালের নগর, নদী, পথ, সমাজ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডাল সাহেব ঐ সমস্ত বিষয় গ্রীক ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা ঐ অনুবাদ অবলম্বন করিয়া সেই সকল বিবরণ লিখিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়—পাটলীপুত্র।

বর্ত্তমান পাটনানগরের নাম পুরাকালে পাটলীপুত্র ছিল। বায়ুপুরাণে ইহাকে কুসুমপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে এবং মুদ্রারাক্ষস নাটকেও এই নাম পাওয়া গিয়াছে। বায়ুপুরাণের মতে অজাতশত্রুর পৌত্র, রাজা উদয়াশ্বের দ্বারা এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। উদয়াশ্ব বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গৌতম মুনির সমকালীক লোক ছিলেন। খ্রীঃ পূর্ব্বে ৫৫০ অব্দে গৌতমের মৃত্যু হয়, সুতরাং ২৪৫০ বৎসর হইতে চলিল পাটনানগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, গৌতম গঙ্গা পার হইয়া যখন রাজগৃহ হইতে বিশালনগরে যাইতেছিলেন তখন দেখিলেন যে, অজাতশত্রুর মন্ত্রীগণ বৃজি নগরবাসীদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য পাটলীগ্রামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন এবং বলিলেন যে, কালে ঐ দুর্গ এক বিস্তীর্ণ নগরী হইবে। অতি অল্প দিনেই উদয়াশ্বের দ্বারা তাহাই সংঘটিত হইল। চন্দ্রগুপ্ত এই উদয়াশ্বের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষ। চন্দ্রগুপ্তের সভায় যে গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে পাটলীপুত্র সিন্ধুনদের তট হইতে ১১৪৯ মাইল অন্তর। বর্ত্তমান গণনা অনুসারে কেবল ৬ মাইল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, সিন্ধু হইতে পাটলীপুত্রের ব্যবধান ১১৫৫ মাইল। এ প্রভেদ অতি সামান্য, গণনায় ভ্রম বা সিন্ধুর উপকূলের হ্রাস বৃদ্ধি নিবন্ধন সম্ভব হইতে পারে, অথবা উভয় গণনাই এক স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া একই স্থানে শেষ হয় নাই বলিয়াও এই সামান্য প্রভেদের কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যৎকালে পাটলীপুত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল এবং হিরণ্যবাহু ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে মীমাংসা হইয়াছে যে, হিরণ্যবাহু ও বর্ত্তমান সোননদী একই। এই সঙ্গম স্থল নদীর গতি অনুসারে এক্ষণে কিছু পশ্চিমে সরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। মেগাস্থেনিস বলেন পাটলীপুত্র গঙ্গাতীরে ১০ মাইল দৈর্ঘে ও ২ মাইল প্রস্থে বিস্তৃত ছিল। এই নগরের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রাচীর ছিল, প্রাচীরের উপরে প্রহরীদিগের জন্য ৫৭০টী প্রকোষ্ঠ ছিল এবং নগর প্রবেশের জন্য ৬৪টী বৃহৎ তোরণ ছিল। তীরন্দাজদিগের তীর ছুড়িবার জন্য প্রাচীরের সমস্ত গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ বা রন্ধ্র ছিল।

এই প্রাচীরের বাহিরে সমস্ত নগর বেষ্টন করিয়া একটী খাল খনন করা হইয়াছিল—ঐ খালের গভীরতা ৩০ হাত। এই খাল গঙ্গার সহিত সংযুক্ত ছিল, তদ্দ্বারা নগরের আবর্জ্জনা পরিস্থত হইত এবং শত্রুদিগের আক্রমণও অনেকাংশে নিবারিত হইত। ১৮৭৬ খ্রীষ্ট অব্দের শীতকালে বর্ত্তমান পাটনা নগরের স্থানবিশেষে খনন করিতে করিতে অতি কঠিন কাষ্ঠের বেলিং দেওয়া একটী অতি প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় ইহাই পাটলীপুত্রের বেষ্টন—প্রাচীরের অংশ হইবে। নগরের প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত পথের এবং বিস্তৃত বাজারের বিবরণ পাওয়া যায়। পথ সকল সরল, দীর্ঘ, সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কার ছিল। বাজারে নানা প্রকার সুসজ্জিত দোকান ছিল—তাহাতে খাদ্য, পরিচ্ছদ বা বিলাসের কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না।

এক অতি বৃহৎ অট্টালিকায় রাজপ্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তথায় রাজা এবং অন্তঃপুর বাসিনী পৌরস্ত্রী ব্যতিরেকে আর কেহ বাস করিতে পাইত না। রাজার শরীর-রক্ষক প্রহরীগণকে রাজভবনের বাহিরে থাকিতে হইত। অন্তঃপুরের প্রহরাকার্য্যে স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকিত। এই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে আজীবন ক্রীতদাসী হইতে হইত। মেগাস্থেনিস অন্তঃপুরসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলেন নাই, সুতরাং নিকেটরের কন্যা যবনীবাণী অবরুদ্ধা হইয়া কি প্রকারে কালযাপন করিতেন, তাহা বলা যায় না। রাজাকে আপন প্রাসাদ মধ্যেও সর্ব্বদা প্রাণভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইত; তিনি দিবসে নিদ্রা যাইতেন না এবং রাত্রিতেও অনেক সময়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিতেন। বিজানি কে কখন হত্যা করে, এই ভয়ে তাঁহার কিছু মাত্র শান্তি ছিল না। দোষীর পক্ষে বিজীত [illegible] এমনই অশান্তিময় রাজ্যই বটে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য।

---

৩ জগৎরাম রায়ের রামায়ণ।

ভরতসম্বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ধেয়ে গিয়া প্রণমিয়া মায়ে কন কথা,
রাজপাট শূন্য কেন নাহি দেখি পিতা।
জনকে না দেখি গো জননী যায় প্রাণ,
কোথা পিতা আছে মাতা বলহ বিধান।

কৈকেয়ী বলেন বাপু এস বস কোলে,
চিন্তা ত্যজ চুম্ব দেহ বদনকমলে।
পশ্চাতে কহিব যাতে উদ্বেগ করিল,
আগে মোর না বাপের মঙ্গলাদি বল।

যুধাজিৎ,১) মাতা মোর আছেন কেমতে,
কেকয় দেশের শুভ বল দু ভাইয়েতে।
ভরত বলেন তথা সব সুমঙ্গল,
অযোধ্যা আঁধার কেন বিবরণ বল।
অন্য কথা নহে কচি রুচি সব বাজে,
শীঘ্র কহ পিতা কোথা না করিহ ব্যাজ।
মায় বলে অরে বাছা না করিহ শোক,
তব পিতা গতরাত্রে পাইল পরলোক।
এই কথা মাতামুখে দুই ভাই শুনি,
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল অমনি।
হা পিতা হা পিতা বলি ঐ কি কাদে উচ্চৈস্বরে,
ছন্ন করি পরিহরি গেলা কোথাকারে?
তোমা বিনা লালনপালন কে করিবে?
চারি ভাই কার কাছে হট(২) করি রব?
মরণেরকালে মোরে দূরে পাঠাইয়া,
শ্রীরামের করে মোরে না গেলে সঁপিয়া।
এই বড় দুঃখ মোর বুকেতে রহিল,
বিধির ঘটনা ইহা কপালে এ দিল।
এইমত তাপিত ভরত পুন কন।
কোন রোগে মৈলা পিতা বল বিবরণ।
মৃত্যুকালে কোন কিছু বলেছেন পিতা?
অকস্মাৎ কাল কেন হৈল সর্ব্বথা?
কেকৈ বলেন বাপু মিছা নাহি বলি,
অস্বাস্থ্য নাহিক রাজা হৈল ব্যাকুলি।
হা রাম! লক্ষ্মণ সীতা ডাকি ঘনে ঘনে,
সারারাত্রি এই বলি ডাকিল রাজনে।
কোথা রাম গুণধাম প্রাণত্যজে পিতা,
এই শুন বিবরণ বলিনু সর্ব্বথা।
ভরত বলেন মাতা কি বল বচন,
এখানে কি নাহি ছিল কমললোচন?
লক্ষ্মণ গেছিল কোথা? কোথা ছিল সীতা?
সারারাত্রি ডাকি কেন প্রাণ ত্যজে পিতা?
মাতা কন ভরত শুনহ আদ্যোপান্ত,
তোমার করেছি কার্য্য মন করি শান্ত।
যানে করিবারে রাজা রাজ্য কৈল সাধ,
তাহা দেখি আমি হথে গণিনু প্রমাদ।
পূর্ব্বে বর ছিল মোর মনে পড়ে গেল,
দুই বর সেইকালে নৃপ ভিক্ষা দিল।
এক বরে তোমারে করিনু রাজ্যেশ্বর,
আর বরে বনে পাঠাই গহন ভিতর।
জটাধারী করি তারে বনে পাঠাইয়া,
বনবাসী কৈনু তারে বাকল পরাইয়া।
তার সহ স্নেহভরে গেছে সে লক্ষ্মণ,
পতিব্রতা সীতা সনে করিলা গমন।
তিন জন গেল তব পিতা দুঃখী হৈল,
রামরাম জপি ভূপ প্রাণ ত্যাগিল।
অংশীরে নির্ব্বংশ করি কৈল বনবাসী,
পাটে রাজা হও পুত্র মায় বলে হাঁসি।
বজ্রাঘাৎ মত ধ্বনি শুনি মাতৃতুণ্ডে,
অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে সেই দণ্ডে।
ধূলিতে ধূসর মনোহর কলেবর,
জ্ঞান হত হৈল দেহ কাঁপে থরথর।
হা! হা! ধ্বনি করি ধরণিতে দুহে লোটে,
আপন হস্তের মাংস ক্রোধে দন্তে কাটে।
ভূমে পড়ি গড়ি কভু প্রভুরাম ডাকে;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ক্ষিপ্ত ন্যায় থাকে।
হায়! হেন দায় কেন দিল মোরে ধাতা?
কোথা মোর শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা মাতা?
সাধুরে লক্ষ্মণ তোর সফল জীবন!
বনেতে সেবন কর শ্রীরাম চরণ।
জানকী কণকলতা আমার কারণে,
বাস ত্যজি তিন জন গেলেন কাননে।
এ বৃত্তান্ত নিতান্ত শুনিতু যদি তথা,
এ মুখ দেখাতে তবে না আসিতু হেথা।

(১) যুধাজিৎ—ভরতের মাতুল।

(২) হটকরি—স্পর্দ্ধাকরি; অভিমান করি।

এই বলি ভরত করেন হায় হায়।
যতনে জগত ভরে হিয়া ফাটি যায়।
একালে কৈকৈ বলে শুন বাপু কথা,
হেন দোষ নয়, বসো, শোক কর বৃথা।
অবি দর করি রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈল,
সম করি রাজ্য কর, বিধি তোরে দিল।
মাতৃবাক্য শুনিয়া ভরত অগ্নিরাশি।
পুর হৈতে দূরে যারে কেবলী রাক্ষসী।
সর্ব্ব বিনাশিনী কালরূপিণী গো তুমি,
তোর ভাব কি করে ধরেছে এই ভূমি?
তো সম পামরী দুরাচারী কে সংসারে?
এ কলঙ্ক শঙ্কা না পশিলি মা অন্তরে?
তোর গর্ভে মোর জন্ম হেন কৈল ধাতা?
মন্দ যে অভাগা আমি, তুমি মোরমাতা।
প্রবেশিব অনলে কি হলাহল খাব?
গলে কাতি দিয়া কিবা আত্মহত্যা হব?
শুন মাগো মন ধরি আমার বচন।
বধ কৈলে স্বামী তুমি পিসের কারণ?
বামে বনচারী করি কি সাধ সাধিলে?
অকলঙ্ক কুলে কালি কি লাগি থুইলে?
কুম্ভীপাক নরকে তোমার হবে স্থিতি,
পুত্র, বধূ, বনে দিলে বধ কৈলে পতি।
বন বামে বাকল পরালে কি করিয়া?
কেশে জটা কৈলে আভরণ সব নিয়া।
কেমত হিয়াতে বামে বনবাসে দিলি?
রাজবাণী লাজ খেয়ে কি কাজ করিলি?
মাতা হয়ে দয়া মাতা কিছু না জন্মিল?
বাম মুখ দেখি তোর বুক না দ্রবিল?
দেখ দেখি পশু পাখী ঝুরে যার তরে,
পদধূলে শিলা তরে খ্যাত এ সংসারে।
এজনে কাননে যেতে কি করি বলিলি?
সে মুখমণ্ডল দেখি ব্যাকুল না হলি?
প্রজাগণ অচেতন লোটায় সকল,
যমপুরী সব হেন অযোধ্যামণ্ডল।
হায় মরি কিবা করি বধ শত্রুঘন?
মা হইয়া দায় দিয়া নাশিল জীবন?
এ রাক্ষসী হাসি হাসি বসি সিংহাসনে,
উপদেশ যে বলে সে শুনিব কেমনে?
বল যদি মাসে বধি সব দুঃখ মেটি।
নয় বা ইহার আগে হিয়া যায় ফাটি।
যে দেশে কৈকৈ নাম না শুনিব কাণে,
সেই দেশে যোগবেশে যাব দুই জনে।
শত্রুঘন করপুটে নিবেদিতে বলে,
মন দিয়ে শুন দাদা বলি পদতলে।
দৈবকালে দৈব্য হলে তবে সে নিস্তার,
উপমতি বৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার।
উদ্বেগ করহ রঘু, ভোজন- (১)।
নিদ্রা আদি সেবাগানে দণ্ডে দণ্ডে দন।
যে রাজার যে উচিত সেই সে কর্ত্তব্য,
হঠাৎ রাজার করে কর্ম্ম সে অতি অভব্য।
গায় অদ্ভুত রঘুনাথ সুত গায়,
দ্বিজ জগৎরামে রাম রেখো রাঙ্গা পায়।

বিমুখ হইল বিধি, এ সব লিখিল যদি,
এ কলঙ্ক কেবা খণ্ডাইবে,
কোপকোপ কর দাদা, ধর্ম্মে পাপ হবে বাধা,
ধর্ম্ম গেলে সহায় কে হবে।
ধর্ম্ম অন্তের গতি, ধর্ম্মে বুদ্ধি সুসন্ততি,
ধর্ম্মে করে কলঙ্ক বারণ।
ধর্ম্ম অনাথের বন্ধু, ধর্ম্মে তরে দুঃখ সিন্ধু,
ধর্ম্ম হৈতে বিপাক তারণ।
ধর্ম্ম যে ভাবতে রাখে, পবিত্রব্রহ্ম রাখে তাকে,
ধর্ম্মের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।
ধর্ম্ম যেবা করে নষ্ট, সে পায় সদত কষ্ট,
স্পষ্ট বলি শুন জ্যেষ্ঠ ভাই।

---

(১) ইচ্ছাপূর্ব্বক এখানে দুইটী বর্ণ লোপ করা হইয়াছে। সেটি সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বিষ খেতে কর সত্য, তাতে হবে আত্মহত্যা
মাযে বধি মাতৃহত্যা হবে।
যার জন্য অতি কোপে, কবিবারে যাও পাপে
তবু রামধন না পাইবে।
এ অযোধ্যা অন্ধকার, দেখে এলে দশা তার
পিতা কোথা আছেন কি মতে?
পিতার না হলে গতি, ইথে না গণিলে ক্ষতি
মতি কর দেশান্তরে যেতে?
ভেবে দেখ মনে মনে, ঘনশ্যাম ঘোরবনে,
বুঝি সূর্য্যবংশ ধ্বংশ হয়।
যুক্তি দিতে নাহি লোক, ত্যাগকর শর শোক
আর কি বলিব তব দাস।
আমি সে কিঙ্করাভাস, তোমার দাসের দাস
তোমা বুঝাবারে কিবা ক্ষম?
ধৈর্য্য হয়ে কার্য্যকর, মানসে সন্তোষ ধর,
বিচারিয়ে কর উপক্রম।
শত্রুঘ্ন পুনঃ পুনঃ, ভরতে কহেন হেন,
তারপর বলেন ভরত,
অদ্ভুত পুরাণ মত, অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যমত
মন্দমতি রচয়ে জগত।

আর মোর প্রাণে কায নাই।
ভাই রাম গেছে ধাম ত্যজিয়ে!
এইক্ষণে যাব, যেথা রাম পাব,
আনিব কানন খুঁজিয়ে।
কি লাজ কি লাজ, গৃহ ত্যজ ত্যজ,
ব্যাজে আর কায নাই,
চল চল চল, পরিয়া বাকল,
সকলে রামের ঠাঁই।
শুন শুন ভাই, জুড়াবার ঠাঁই,
নাই পাই ত্রিভুবনে,
ঘন ঘনশ্যাম, ক্ষণে ক্ষণে রাম
পড়িছে আমার মনে।
কত শত মত, বদন (?) সঘন দেখি,
গহন কানন গমন করিল সে জন,
ছিছি এধি প্রাণ রাখি।
বসন ত্যজিয়ে, বাকল পরিয়ে,
কেশপাশে জটা করি,
ত্যজি আভরণ, রাম গেলা বন,
এ তনু কি করি ধরি।
কেন আর কাঁদ, কেশে জটা বাঁধ,
আভরণ দূরে থুয়ে,
গহন কাননে, প্রভুর চরণে,
শরণ লইব গিয়ে।
পদেতে ধরিয়া, আনি ফিরাইয়া,
দয়াল গুণের নিধি,
নতুবা পরাণ, ত্যজিব তখন,
না আসে না ফিরে যদি।
ইহার বিচার, এই সারোদ্ধার,
আরত বিচার নাই।
চল দুই ভাই, একবার যাই,
কৌশল্যা মায়ের ঠাই।
এই ভাবি মনে, কাঁদিয়া দুজনে,
কৈকেয়ীরে ত্যজি যায়,
কৌশল্যা নিকটে, করি পাণিপুটে,
মা বলি বিকলে ধায়।
কলুষ প্রচুর, কলেবর দূর,
জগত ভূসুর গায়,
শুন দয়াময়, না হয়ো নিদয়,
ঠেকিলে হে কোন দায়।

রোদন করেন দুঁহে বেদন পূরিত,
কৌশল্যার সদনে গেলেন ত্বরিত।
দেখিলা কৌশল্যা মায়ে ভূমে অচেতন।
হেনকালে মা মা বলে বন্দিলা চরণ।
ভাবে মনে রাণীগণে এলো ফিরে রাম,
মা, মা, বলে ডাকে সেই নবঘনশ্যাম।

মা বলিতে আর মোর আমার কে আছে ?
মোর পীড়া মনে করি ফিরিয়া এসেছে।
রামের ভ্রমেতে সে ভরতে লয়ে কোলে,
চক্ষুমুদি চুম্বখান বদনকমলে।
এস বস প্রাণরাম হিয়ার উপরে,
কেবল দয়াল বট জানিনু তোমারে।
মরণের কালে দরশন দিলে আসি,
এস মা জানকী দেখি তোর মুখশশী।
আমরে লক্ষ্মণ দুঃখ মোচন করিলে,
প্রাণ রামে নিজ ধামে কিবা যে আনিলে।
এইমতে ভ্রমে কত নানাকথা বলে,
ভাব দেখি ভরত লোটায় ভূমিতলে।
মৃতকল্প হয়ে অল্প কন ধীরি ধীরি,
পাপীষ্ঠ ভরত আমি বংশের কুঠারী।
মোর হেতু তোর হৈল এতেক দুর্গতি,
যুগে যুগে জগতে রহিল এই খ্যাতি।
নয়ন না মেল মাত চক্ষু মুদি থাক,
আমা অভাগার আর বদন না দেখ।
তখন ভরতবাণী শুনি বাণী চায়,
ভরতেরে জ্ঞান হয়ে কাঁদি বলে তায়।
আজি তিন দিন আমি হীনজ্ঞানে আছি।
রামনিধি নিল বিধি আর নাই বাঁচি।
একক্ষণ প্রাণধন না দেখিলে মরি,
পাষাণ চাপায়ে বুকে আছি যে পাসরি।
নির্লজ্জ আমার প্রাণ ব্যাজ করি আছে,
কত সে পাইছে সাজা তবু না যাইছে।
ভাব দেখি ভরত ভাবতে মোর হেন,
এত শোক পেয়ে লোক বাঁচে কোন জন।
রাম হেন পুত্র মোর সীতা হেন সতী,
লক্ষ্মণ সহিত বনভূমে কৈল স্থিতি।
জটাধারী রূপে বাঘবাসী গেছে বন।
পরেছে বাকল বাছা ত্যজিয়ে ভূষণ।
ভাল হৈল এলে বাছা নাহি ছিলে ঘরে,
দিবা নিশি শোকে ভাসি কহিব কাহারে।
পতি, পুত্র, বধূ গেল কৈকেয়ী হইতে,
তনু মোর জর জর শুকথা কহিতে।
ভূমি মাঝে চিরজীবি হও পুত্র তুমি,
পিতৃবাক্যে রাজা হয়ে পাল এই ভূমি।
মোর যে কপালে ছিল তা করিল ধাতা,
কৈকেয়ী নিকটে সব শুনিয়াছ কথা।
তোমার আজ্ঞাতে পরামর্শ কৈল ঘটে,
সকল শুনেছ বাছা মায়ের নিকটে।
এই বলি ভূমে পড়ি করেন রোদন,
লোচনযুগলে বহে ধারার শ্রাবণ।
তখন ভরত কন শুনগো জননী,
শ্রীরামের বনবাস আমি যদি জানি।
শত শত ব্রহ্মহত্যা লাগয়ে আমারে,
লয়ে বনে দিতে যদি কহেছি মায়েরে।
গুরুনারী গুরুসুত করিলে বিনাশ,
সেই পাপ লাগে যদি জানি বনবাস।
সহস্র গোধন নিজে হনন করিলে,
শত শত বিশ্বাসঘাতক পাপ কৈলে,
পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি,
এসকল দায়ে ভাগী কিছু জানি যদি।
সর্ব্বপাপ দায়ী তবে শুন গো জননী,
কায়মনোবাক্যে যদি লেশমাত্র জানি।
তোমার সাক্ষাতে মা চরণে দেই হাত।
আমি কি বলিব বনে যেতে রঘুনাথ ?
দ্বিজ জগতরাম বলে রামপদতলে,
আসন্ন সময়ে যেন জিহ্বা রাম বলে।

কাননবালা।

[পারিস্থ্য কথা।]

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর অঞ্চলে বমভী পল্লীতে এক ঘর বেস বড়মানুষের বাস ছিল, তাহাদেরই কথা আজ আমরা বলিব। রাধাকান্ত দত্ত বাটীর কর্ত্তা। তাঁহারা দুই সহোদর, কনিষ্ঠের নাম রামকান্ত। রাধাকান্তবাবুর সন্তানের মধ্যে এক শিশুকন্যা। রামকান্তর দশমবর্ষীয় পুত্র ও একটী ২।৩ বৎসরের কন্যা, অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, কেবল এই দুইটী ভিন্ন আর সমস্তই কালের উদরসাৎ হইয়াছে। রাধাকান্তবাবুরও অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি—সে সময়ে তাহার একটী শিশুকন্যা ভিন্ন আর কেহই জীবিত ছিল না।

রামকান্তের অতি শৈশব অবস্থাতেই মাতার মৃত্যু হয়,—জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার যত্নে লালিত হইয়াছিলেন। রামকান্ত স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও দুরন্ত ছিলেন,—পাঠশালার বালকদিগের সহিত কিছুমাত্র বনিত না,—তাহার উপর গুরুমহাশয়ের প্রত্যহিক বেত্রচালনা—সুতরাং ত্বরায় তাঁহাকে পাঠশালার পাঠ শেষ করিতে হইল। অচিরাৎ ইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। সহসা পিতার মৃত্যু হইল,- জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষয়কার্য্যে মনোযোগ দিলেন, বিষয় ব্যাপারেই তাঁহার সমস্ত সময় যাইত, সুতরাং কনিষ্ঠের প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতেন পারিতেন না,—রামকান্তও বেশ সুযোগ পাইয়া দুইদিন ভাঁড়াইয়া একদিন বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন। কখন রাধাকান্ত অবসর বুঝিয়া কনিষ্ঠকে লেখা পড়ার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, ভ্রাতা কাঁদিয়া অগ্রে আসর গরম করিয়া লইতেন—তার পর তিনদিন বাটীর সহিত সম্বন্ধ ছাড়িতেন,—কোথায় লুকাইতেন—কোন বৃক্ষে অবস্থান করিতেন কেহই সন্ধান পাইত না। গৃহিণী পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন—রামকান্ত কাঁদিতেন—মাঝে মাঝে নিরুদ্দিষ্ট হইতেন—সে পীড়ন তাঁহার অন্তরেই বাজিত। ক্রমে রামকান্তের বয়সের সহিত অভ্যাসও পাকিয়া উঠিল। স্থানান্তরে আড্ডা খুলিলেন,—নাচ তামাসার মজলিস্ পড়িতে লাগিল—পাঁচ জনের ভিতর এক জন হ
দাঁড়াইলেন।

PRINTER'S CERTIFICATE.

I Hirode Chunder Mookerjee hereby certify that the accompanying book was first delivered out of the Press on the 1st January ...day of 1st January ...1885

DURBHUNGA

THE 15th January 188 — } Hirode Chunder Mookerjee

Printer

STATEMENT

Title of the Book	Pakshik Pramukshuk
Language	Bengali
Name of Author.	Contributed by various writers
Subject	Miscellaneous
Place of Printing	Durbhunga
Place of Publication	Durbhunga
Name of Printer.	Hirode Chunder Mookerjee
Name of Publisher	Hirode Chunder Mookerjee
Date of Issue.	1st January 18[illegible]
Size and Number of Pages	Royal octavo 32 pages,
Number of the Edition	1st Edition,
Number of Copy.	500
Printed or Litho-Graphed	Printed
Price.	4 As each.

যদি কেহ বলেন, এ সব ত টাকার কায—এত টাকা সংগ্রহ হইত কোথা হইতে? আমরা তাহা ঠিক শুনি নাই। কেহ কেহ বলিত, ভ্রাতার অগোচরে ভিন্ন গ্রামে গিয়া কোন ক্ষুদ্র বিষয় বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতেন,—কোন প্রজার দখলীসত্ব না মঞ্জুর করিয়া পীড়নেরদ্বারা কিছু অর্থ সঞ্চয় হইত,—কখন বা গৃহিণীকে বিশেষ প্রয়োজনের ভাণ দেখাইয়া—অথবা না দিলে, বাগানে পুষ্করিণী আছে—গৃহে বজ্জু ও শাণিত ছুরিকা আছে তাহার ভয় দেখাইয়া কিছু আদায় করিয়া লইতেন। তাঁহার উপর গৃহিণীরও বিশেষ স্নেহ ছিল—চাহিলে না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে বাল্যলীলা সাঙ্গ হইল। গৃহিণী বুঝিলেন—রামকান্ত যেরূপ হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে অচিরাৎ বিবাহ না দিলে আর বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইবে—এমন পাত্র শুনিলে কে কন্যা দিবে? এ জন্য স্বামীর যাহাতে বিবাহটা হইয়া যায়—তাহার উদ্যোগ হইতে লাগিল। দুই এক মাসের মধ্যে শুভলগ্নে শুভক্ষণে দুই হাত এক হইল—রামকান্তের বিবাহ হইয়া গেল।

বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ বহুপূর্ব্বে ফুরাইয়াছিল—বাটীর সহিতও বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না কিন্তু বিবাহের পর হইতে বাড়ীর সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। ক্রমে দুই একটী সন্তান সন্ততি হইল। ভ্রাতার পীড়নে বিষয় কর্ম্মে একটু মন দিতে লাগিলেন। নিজেও মনে বুঝিলেন, আর এমন করিয়া ক দিন চলিবে? এখন আপন গণ্ডা বুঝিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। সুতরাং এখন তিনি কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইলেন।

পিতা যে যৎসামান্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন রাধাকান্ত সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি প্রভাবে তাহার প্রায় চারি পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাটী ও উদ্যানের বিশিষ্ট সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন। প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সময়ে সে গ্রামে কেহ ক্লেশের মুখ দেখিতে পায় নাই—অন্নের জন্য কাহাকেও লালায়িত হইতে হয় নাই। সকলের প্রতিই সদয়ভাব—সকরুণবাক্য। বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলেও তাহার মুখ হইতে কেহ কটু কথা শুনিতে পাইত না। ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার প্রকৃত আস্থা ও ভক্তি ছিল। গৃহিণী তাহারই মত সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। দীন দরিদ্রকে গোপনে মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার নাম অপর্ণা ছিল—কার্য্যেও তিনি অপর্ণাস্বরূপা ছিলেন। তাহার অমায়িক ব্যবহারে দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন সকলেই মুগ্ধ ও প্রীত হইত, প্রাণ খুলিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিত। অপর্ণাদেবী যে সংসারের কর্ত্রী তাহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে কেন? এইরূপ গৃহিণী না হইলেও সংসার চলে না। সংসার সমুদ্র বিশেষ—ইহাতে গৃহিণীপনা পাকা মাঝীর কাজ। মাঝী শক্ত না হইলে সতত নৌকা ডুবির ভয়। অসন্তোষ অভিযোগ নিয়ত ধূমায়িত—ক্রমে রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত—শেষে সেই অনলে পড়িয়া গৃহ সংসার ভস্মীভূত হইয়া যায়! অপর্ণাদেবী সতত শান্তির জন্য ব্যস্ত ছিলেন, সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত; সুতরাং রোষ কলহের তীব্রশীখা সে গৃহ স্পর্শও করিতে পারিত না।

রাধাকান্ত বাবুর সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে হইত। সকলই তাঁহার নিজে দেখিতে

শুনিতে হইত। নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল। কখন মাথা ধরিত, মাথা ব্যথা করিত, তাহার উপর অমিত পরিশ্রম—অথচ ঔষধ পত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না। গৃহিণী চিকিৎসার কথা কহিলে, বলিতেন,—"এমন লোকের হইয়াই থাকে। যে টাকা আমার চিকিৎসায় ব্যয় হইবে, তাহা দরিদ্রকে দিলে, তাহাদের অনেক কাজ দেখিবে।"

গৃহিণী কহিলেন,—'আগে বাঁচ তবে ত দরিদ্রকে প্রতিপালন করিবে? আপনার শরীর না রহিলে গরীবদের কে খাওয়াইবে?"

রাধাকান্ত হাসিলেন, কহিলেন,—"ইহার জন্য চিন্তা কি? আমার অর্থ আছে বলিয়া এই সামান্য অসুস্থতাকে বড় ভাবিতেছি—যাহাদের অর্থ নাই—তাহারা ইহার অপেক্ষা উৎকট পীড়া তুচ্ছ করে।"

সুতরাং গৃহিণী নিরুত্তর হইলেন। বিশেষত স্বামীর কথার উপর কথা কহা তাঁহার কখন অভ্যাস ছিল না, স্বামী যাহা ভাল বুঝেন তাহাই ভাল,—ইদানিং সুসভ্য রমণীগণের মত আপনার কথাই অমূল্য বলিয়া ধারণা তাঁহার ছিল না।

চিকিৎসার অমনোযোগে ক্রমে তাঁহার মাথা ধরা শিরঃপীড়ায় পরিণত হইল। তখন চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝিলেন। আসন্নকালে সাধুবুদ্ধি আসিল—কিন্তু তখন চিকিৎসায় কোন ফল দেখিল না। ব্যারাম পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই রোগেই তাহার আয়ু শেষ হইল। পিতার সামান্যমাত্র বিষয় হইতে তিনি অমানুষী প্রতিভা বলে স্বল্প কালের মধ্যে একজন বিখ্যাত জমীদার হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় ও অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, একটীমাত্র শিশু কন্যা রাখিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন—বল্লভী পল্লীবাসী আজি তাহাদের পিতা মাতা হারাইল।

এখন রামকান্ত সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুদিন হইতে বিষয় কর্ম্ম বুঝিতে ছিলেন, তাঁহারই অদৃষ্টে এ সব নাচিতে ছিল তাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। তাঁর নিজের বুদ্ধিতে এত আসিত না—তাঁহার পত্নীর বুদ্ধির আলোকেই তাঁহার অন্ধকার ঘুচিয়াছিল। তাই বিষয় কর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজকাল করিয়া শ্রাদ্ধের দিন আসিল, মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। দীন দুঃখী দরিদ্র কাঙ্গাল পেট ভরিয়া অন্ন পাইল—অর্থ এবং বস্ত্রও বিস্তর বিতরণ করা হইল। যেমন করিয়া হউক শ্রাদ্ধটার অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নাই।

যার আদরে গৃহিণী গৃহিণী ছিলেন, সে আদর ত ফুরাইল, তথাপি পাড়ার লোক দেশের পাঁচ জন, বাড়ীর দাস দাসী, অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহাকে গৃহিণীর মতই মানিত। যিনি নূতন গৃহিণী হইয়াছেন, তাঁহার এ সব অসহ্য হইতে লাগিল। গৃহিণী মিষ্টকথা বলিলেও তাঁহার বুকে যেন শেল ফুটিত! তিনি একটা বিহিত চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। অর্থের দ্বারা দাস দাসীকে করতলগত করিলেন। তাঁহার মুখের কাছে পাড়ার বড় বড় ঠাকুরদিদিরাও

দাঁড়াইতে পারিত না, প্রতিবাসিনীরা তাঁহার ধুয়া ধরিল,—তিনিই ঘরণী গৃহিণী তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল। কর্ত্তার রাশ ভারী হইয়া উঠিল। বিবিধ কৌশলে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মালিক হইয়া উঠিলেন। দিন দিন পুরাতন গৃহিণীর মান কমিতে লাগিল। এক বৎসর না যাইতে যাইতে সংসার আর একভাব ধারণ করিল। তিনি আর কিছুরই মধ্যে নন,—তাহার দুইবেলা আহার জোঠে কিনা তাহাও কেহ ফিরিয়া দেখে না। দুই একটা দাসী তাঁহাকে এখনও মানিত—তাঁহার বিষয়ে খোঁজ খবর লইত, নূতন গৃহিণী সে কথা শুনিয়া তাহাদের ধমকাইয়া দিলেন,—তাহারাও আর ফিরিয়া চাহে না। চাকরীর মায়া—জঠরের জ্বালা না থাকিলে তাহারা চাহিত কি না বলিতে পারি না।

এক দিন কথায় কথায় নবগৃহিণী কর্ত্তার নিকট কহিলেন,—"কত দিকে সে কত টাকা মিছামিছি খরচ হইতেছে তা'ত তুমি একবার ফিরেও দেখ না!"

কর্ত্তা কহিলেন—কোথায় কি হইতেছে?'

গৃ। তুমি কি আর তা' করিবে—তোমার কি আর টাকা পয়সায় মমতা আছে?

কর্ত্তা। কেন, কি হইয়াছে বল না?

গৃ। "বাড়ীতে ত একজন লোক রহে'ছে, আবার একজন রাঁধুনী রাখবার কি দরকার?

কর্ত্তা। লোকটা কে?'

গৃ। কে যেন জান না?—ঐ দেমাকী অহঙ্কারী, যার থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়েছে।'

কর্ত্তা। 'ওঃ!—তাই বল—বউ ঠাকরুণ!'

গৃহিণী ঈষৎ ওষ্ঠ বিস্ফারিত করিয়া—কটাক্ষ হানিয়া—অধরে হাসির একটু বিকাশ দেখাইয়া কহিলেন—

"বউ—আবার ঠাকুরুণ!"

কর্ত্তা কহিলেন—যাই হউন—তাঁর বাধাটা কি ভাল দেখায়? লোকে কি বলিবে?

"লোকে ভাল বলিবে না ব'লে তোমার অমনি রাজ্য পাঠ উঠে যা'বে আর কি? তুমি কারুর কথায় কাণ দেবে কেন?"

গৃহিণীর বুদ্ধির আলোকে আবার রামকান্তের ধাঁধাঁ দূর হইল। তিনি অনেক বুঝিয়া স্থির করিলেন, কাল হইতে পাচিকার জবাব হইবে। ভ্রাতৃজায়া কাল হইতে রন্ধন করিবেন। গৃহিণী শুনিয়া প্রীতা হইলেন,—তাঁহার প্রথম আর্জ্জিত এইরূপে পেশা হইয়া গেল।

কথা যখন অভাগিনী বিধবার কাণে গেল,—তাঁহার চিত্ত কি রূপ হইয়াছিল জানি না,—সে নিদারুণ দুঃখে সহানুভূতি করিতে কেহ নাই। কাল রাজরাণী ছিলেন, আজি পথের কাঙ্গালিনীর অপেক্ষাও হতভাগিনী হইয়াছেন। তাঁহার কোন প্রতিবাসী তাঁহাকে অতিশয় যত্ন করিতেন; তাঁহারা শুনিয়া বড় ব্যথিত হইলেন; সে বাটীর গৃহিণীর সহিত অপর্ণাদেবীর অতিশয় সদ্ভাব ছিল, তিনি এ কথা শুনিয়া মর্ম্ম পীড়িতা হইলেন। অপর্ণাদেবী হাসিয়া কহিলেন,—"ভগিনি তাহাতে কি? আজিই আমাদের দেশে রন্ধনটা নিম্নশ্রেণীর কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে রাজবধূ রাজকন্যাগণ আনন্দের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক রন্ধন করিয়াছেন! তাহা তাঁহাদের কত

সুখ্যাতির কাজ ছিল। আর আজ পোড়া দেশে সে ভাব উঠিয়া গিয়াছে, স্বামী উপার্জ্জন করিতে শিখিলেই অমনি স্ত্রীর হস্তপদ বদ্ধ হইয়া যায়, বন্ধন দূরে থাক, গৃহের কুটাটী নাড়িতেও ননীর অঙ্গ গলিয়া যায়। স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজনকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইবে ইহার অপেক্ষা সুখের কথা কি আছে? তবে অভ্যাস নাই—তা' ক্রমে অভ্যাস হইবে।"

সেই দিন হইতে অপর্ণাদেবী স্বচ্ছন্দে রন্ধনাদি করিতে লাগিলেন। এবং দশীর ক্ষুৎপিপাসা তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী থাকিতেন। মনে যেন ক্লেশ নাই দুঃখ নাই, হৃষ্ট চিত্তে সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। কেবল এক এক বার ভাবিতেন, আমি বড় পাতকিনী নতুবা নিয়তির এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইবে কেন? আর কিছু ক্লেশের কারণ ছিল না, বরং আর কিছু ভাবিবার বিষয় ছিল না।

অপর্ণাদেবী খুব অল্প সময়েই স্বহস্তে পাক করিয়াছেন। নিজের ইচ্ছা স্বত্বে প্রয়োজনাভাবে কখন পাক করিতে হইত না। এখন বন্ধন শালার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছে। অধিক পরিশ্রম, অনবরত ধূমাচ্ছন্ন গৃহে বাস, নিয়ত অগ্নির উত্তাপ এই সমস্ত এবং অন্যান্য কারণে, তাঁহার চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হইল। চক্ষুর পীড়া কি ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ—যিনি কখন অনুভব করিয়াছেন—তিনিই জানেন! কিন্তু এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তাঁহাকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইতে লাগিল; বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই! কেহ ফিরিয়াও চাহে না—কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না! তাহাদের সময়ে আহার পাইলেই হইল! এক দিন যাতনায় অস্থির হইয়া গৃহিণীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন,—বাঁধিবার অন্য বন্দোবস্ত হউক আমি চক্ষু লইয়া বড় অস্থির হইয়াছি—আজ রাঁধিতে পারিতেছি না!

গৃহিণী দাসীদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন রাঁধিবে না, তাই বলিলেলেই হইত—চোকের ওজর কেন?

শুনিয়া অপর্ণাদেবী চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। রামাকে কহিলেন, গৃহিণীকে বলিও আমার রাঁধিতে কিছু আপত্তি নাই দেখিতেছত এই চোক্—আর যে যন্ত্রণা তা' ভগবানই জানেন,—বিশেষ, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। একটু সাবি, রাঁধিব বৈ কি, ছেলে পুলে খাইবে আমি রাঁধিব না।

অপর্ণাদেবী সরলভাবেই বলিয়াছিলেন, রামা মাঠাকুরাণীর কাছে গিয়া একটু ঠোঁট ঘুরাইয়া—চোক ঘুরাইয়া হেলিয়া দুলিয়া কহিল, 'রাঁধব না ব'ল্লেই ত চুকে যে'ত বাপু, আবার ভগবানকে ডাকা কেন?—যার থাও তারেই শাপ মন্নি?"

গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন, কি বল্লিরে রামা? শাপ মন্নি। কাকে? আমাদের?"

রামা একটু রাগে তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল,—'তা' নইলে কি আর ও পাড়াদের দেবে? বলে—'যার শিল তার নোড়া, তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।"

গৃ। 'ওমা কি হবে! কি আস্পর্দ্ধা আসুন আগে তিনি এর একটা বিহিত কর্ত্তেই হবে।

রা। 'তিনি আবার আস্‌বেন্ কি? তুমি যা হয় বল না আমি বলে আস্‌ছি। আমার ইচ্ছে হ'ল তখনই মাগীকে মুখের মত শুনিয়ে দিই।"

গৃহিণী কহিলেন -'না বামা, তাঁকে আগে আস্‌তে দে, তার পর যা বলবার সেই ব'লবে। এর একটা বিহিত ব্যবস্থা আজ ক'রবই।"

বামা স্থানান্তরে কার্য্যে গেল। গৃহিণী ক্ষণেক আস্ফালন করিলেন, কন্যার এক আধ যা প্রহার হইল, আপনি মাথা খুঁড়িয়া কপাল ঢিবি করিলেন। তখন স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে রামকান্তবাবু দেখা দিলেন। আস্তিয়াই—স্ত্রীর মাথা ঢিবি চক্ষু রক্তবর্ণ, কোলের মেয়েটা তখনও চেঁচাইতেছিল একবার স্তন্যপান করিতেছে একবার ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে দেখিলেন, বলিলেন "ব্যাপারটা কি?"

গৃহিণী আর মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না কাঁদিয়া ফেলিলেন ধীর লোকের যাহা ব্রহ্মাস্ত্র তাহা ধরিলেন, আপনার অদৃষ্টের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া শেষে কহিলেন,—"এমন কালসাপও পুষ'ছ—এরত বিহিত কিছু ক'রবে না? যতদূর মুখ ততদূর কথা—দশটা নেই পাঁচটা নেই আমার এই দুটো গুঁড়ো—তাদের কি না শাপ মন্নি।"

কর্ত্তা। কে বল্লে?"

গৃ। "বামা স্বকর্ণে শুনে এয়েছে।"

কর্ত্তা। "কি হ'য়েছিল?"

তখন গৃহিণী অবসর বুঝিয়া সেই বামার কথাই নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া কর্ত্তাকে নানা উপদেশ ও ব্যবস্থার সহিত বর্ণনা করিলেন।

রামকান্ত আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ অপর্ণাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার অপরাধের কথা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন,—"কাল একথা, আজ সে কথা কেন যে হয় বুঝিতে পারি না—তোমার বিসের দুঃখ বা দেখি যে তুমি এত কর্চ্ছ। আজকাল মা বাপকেই লোকে পুষিতে পারে না, তা' আবার ভাগ্নে বউ তবু আমি সে সব মনে করিনে, আমি বত সহ্য করি। এতদিন যে তোমায় পোষ্য পরিবার দিচ্ছি সেটা তোমার অনুগ্রহ ভাবা উচিত। কিন্তু আমাদের তুমি কি করচ দুটো বেধে দেবে—তাতে আজ মাথাব্যথা, কাল চোক ওঠা, এই ত একটা না একটা ওর আছেই। যাক্ সে সব আর কথা বাড়াতে নাই তুমি এক কাজ করিও এই ঘরটাতে থাকিও, কোন কষ্ট হইবে না বেশ থাকিবে আমি ভাণ্ডারীকে বলিয়া দিব, রোজ তোমার যা' দরকার তা দিবে। ঐ মেয়েটার একটু দুধ তা' বামা খাও যাইয়া দিয়া যাইবে।"

অপর্ণাদেবী মস্তক নত করিয়া ধীরভাবে কহিলেন,—

"তুমি যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই হইবে, আমি কে? আমাকে তা' আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

রামকান্ত সন্তুষ্ট হইলেন,—ভাবিলেন মাগিকে খুব ফাঁকি দিতেছি। ধর্ম্মের বক্ষে, ন্যায়ের মস্তকে, পদাঘাত করিলেন, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না।

বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা!—যিনি এক দিন শত শত দুঃখীকে অন্নদান করিয়াছিলেন—শত শত আত্মীয় কুটুম্বকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা আজি আত্মীয় কন্যাগণের অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছে! তাহারা পেটে দু'টা খাইতে

পায় অপর্ণাদেবীর তাহাও আজকাল জুটে না। কাহার কাছে এ দুঃখের কথা জানাইবেন? সংসারের গৃহিণীর হাতে কিছু না কিছু সঞ্চিত অর্থ থাকেই কিন্তু অপর্ণা দেবী সঞ্চয় কাহাকে বলে জানিতেন না—ভাবী পরিণামের জন্য এক দিনও ভাবেন নাই—তাই তাঁহার দুঃখের আজি সীমা নাই। সঞ্চয় না করিয়া তিনি অকাতরে দীন দুঃখীকে দান করিয়াছিলেন—অবহিত চিত্তে দরিদ্রের প্রতি করুণা প্রকাশের কি এই পুরস্কার? পুরস্কার আছে। পাপের পতন—ধর্ম্মের অভ্যুত্থান অবশ্য আছে। সংসারের সমগ্র চিত্র যে কখন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে সেই জানে—পরিণামে সত্য এবং ন্যায়েরই জয় হইয়া থাকে।

এক ঘর প্রতিবাসী কেবল তাঁহার সহায় ছিল। তাহারা সব কথা জানিত শুনিত, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। তিনি স্বীকৃত হইলেন না, কহিলেন, "না, আমার কোনি কষ্ট নাই, বসুন্ধরাকে বলিও মেয়েটাকে একটু দুধ দেয়। আমার একরূপে চলিবে, তোমরা আপন জন,—অভাব হইলে চাহিয়া খাইব।"

আর অভাবের বাঁকি কি তা' তাহারা মুখ ফুটিয়া বলিলেন না।

বসুন্ধরা প্রতিবাসী গৃহিণীর ননদিনী; তিনি সর্ব্বদা অপর্ণাদেবীর নিকট আসিতেন; অপর্ণাদেবীর কন্যাটীকে বড় স্নেহ করিতেন। এই প্রতিবাসীদিগের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হরিপ্রসন্ন বসু সে বাটীর কর্ত্তা ছিলেন। হরিপ্রসন্নবাবু একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। সকল রকমেরই ব্যবসায় তাঁহার ছিল—কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে চাউলের আড়ৎ ছিল, এতদ্ভিন্ন সরিষা, তিসি, পাম, পাট প্রভৃতিরও ব্যবসায় ছিল। সম্প্রতি তাঁহার কাল হইয়াছে সংসারে স্ত্রী—এক বিধবা ভগিনী, ও একটী পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক পুত্র। পুত্রটীর নাম "কিরণ।" অপর্ণাদেবী কিরণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কিরণও শিশু সরসীকে বড় আদর করিত, নিজের সঞ্চিত অনেক মূল্যবান পুতুল খেলেনা দিত, সরসী তার আপনার ভগিনী বলিয়াই বিশ্বাস ছিল—বিশেষ এখন সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ীতে থাকে সেও এক কারণ।

ভাণ্ডারীর উপর বরাদ্দ ছিল, প্রত্যহ অপর্ণাদেবীকে আহারীয় বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিবে, ভাণ্ডারী তাচ্ছিল্য করিয়া এক দিন দিত, এক দিন ভুলিয়া যাইত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই দিত না। অপর্ণাদেবী নীরবে সহ্য করিতেন। মাসে ৫।৬ দিন উপবাসে কাটিত। বামা কন্যাকে দুধ খাওয়াইয়া যাইবে, এক দিন. দুই দিন খাওয়াইল, তারপর আর তাহার দেখা নাই। প্রথম দিন জল খাওয়াইয়া ভাতের মণ্ড করিয়া খাওয়াইয়া মেয়েটার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন। দ্বিতীয় দিন গৃহিণীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "খুকি এখনো দুধ পায় নাই, কি হইবে? বড় কাঁদিতেছে, আর রাখিতে পারিতেছি না।"

গৃহিণী বামাকে দিয়া বলিয়া দিলেন, "তার আর কি হবে—চেঁচায় ত ঝুড়িচাপা দিতে বলিস্। পাঁচীর আবার দুধ কি?" আপনার কন্যা তখন দাসীর কোলে সুবর্ণের চামচে দুধ খাইতেছিল।

বামাকে আরও কহিয়া দিলেন,—"তা-

ওরীকে বলিস্ ওদের যেন আর কিছু না দেয়। পোচে যাক্—আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হ'ক্—তবু যেন ওদের দিয়ে আস্পর্দ্ধা বাড়ান না হয়।"

অপর্ণাদেবী সব শুনিলেন, তার পর দিন কাজেকাজেই প্রতিবাসী গৃহে কন্যাকে পাঠাইতে হইল। মনে করিলেন আমি যেন পাঁচ দিন না খাইয়া থাকিব দুধের বাছা দুধ না পাইয়া যে প্রাণে মরিবে।

ক্রমে সে কথা মাঠাকুরাণীর কাণে গেল। তার আপসোসের আর সীমা থাকিল না, একপেও জব্দ করিয়া উঠিতে পারিলেন না বলিয়া বড় ব্যথিত হইলেন।

রামকান্ত সে দিন গৃহে ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী বলিলেন, ননী তোমার সহ্যগুণ এত সহিতেও পার। যারতার কাছে তোমার নিন্দা করে তা তুমি ত কিছু করবে না। ওকি মিষ্ট কথায় বাজ? ঝেঁটা মেরে বিদায় করে দাও ঘরে পেট ভ'রল না সেই পোসাদিদের বাড়ী এখন খাওয়া দাওয়া হ'চ্চে।"

"কি কর্ত্তে বল?"

"মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে, মাগীকে বিদেয় ক'রে দাও। যখন একটা উপকারে নেই, তখন অনর্থক দরকার? রেখে কেবল লোকের নিন্দা কুড়ান বই ত নয়।"

রামকান্ত তাই বুঝিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই যুক্তি-সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন, কিন্তু একটা বিশিষ্ট কারণ না দেখাইয়া ইহা কেমন করিয়া সহসা তাড়াইয়া দেন?—আবার না তাড়াইলেও নয়, ভবিষ্যতের অনেক সুবিধা নষ্ট হয়। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অপর্ণাদেবীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

"তোমার অনেক দোষ দেখিয়াও কোন কথা বলি নাই। এখন দিন দিন তোমার যে রূপ ব্যবহার দেখা যাইতেছে তাহাতে কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। লোকে আমার গালেই চুনকালী দিবে। তোমার স্বভাব ভাল হইত—আমি তোমায় অবশ্যই গৃহে স্থান দিতাম। কেবল কলঙ্ক ক্রয় করিতে তোমায় গৃহে রাখিতে পারি না। তুমি আপনার পথ দেখিও। দুষ্টার সন্তানে অধিকার নাই, দাদার যৎকিঞ্চিৎ নিজস্ব আছে—নবসী মানুষ হইলে না দিব কেন? কিন্তু তোমার আর কিছুতে অধিকার দিব না।"

ক্রমে রামকান্ত চলিয়া গেলেন। অপর্ণাদেবী এই বজ্রবাণী শুনিয়া ভূমে পড়িয়া গেলেন। যখন সংজ্ঞা হইল—তখন রাত্রি হইয়াছে—বড় অন্ধকার—আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। পাশে দাঁড়াইয়া বসুন্ধরা—বসুন্ধরার ক্রোড়ে শিশুকন্যা।

বাঙ্গালায় স্বায়ত্বশাসন।

দেশের মধ্যে রাজাই সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। সমস্ত রাজত্বের ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু একটী সমগ্র রাজত্ব চালান এমন বৃহৎ কার্য্য যে একাকী তাঁহার দ্বারা কিছুতেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সেই জন্য, তাঁহাকে অনেকগুলি কর্ম্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, সমস্ত রাজত্বটা অনেকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে তাঁহাকে শত শত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবলমাত্র বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাও সম্যক্ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্য সুসম্পাদিত হইয়া উঠে না। হয় ত যতগুলি কর্ম্মচারীর প্রয়োজন, ততগুলি নিযুক্ত করা রাজার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে, না হয় যাঁহারা নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা হয় বিদেশী, না হয় অনভিজ্ঞ, না হয় নূতন, না হয় সহানুভূতিশূন্য বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা প্রজাবর্গের সকল প্রকার অভাব এবং দুঃখ দূর হয় না। এমন অবস্থায়, রাজকার্য্য সুচারু এবং সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে চালাইবার জন্য রাজাকে এই সমস্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী ভিন্ন স্বয়ং দেশবাসী প্রজাবর্গেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রজারা আপনাদের মঙ্গল এবং সুখ সমৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার রাজকার্য্য করিয়া রাজাকে সাহায্য করে, এবং আপনাদিগের অভাব আপনারাই জ্ঞাপন করিয়া নিজে নিজেই রাজার হুকুম মত তাহা দূর করিবার উপায় বিধান করে। ইহারেই বলে স্বায়ত্বশাসন, এবং পৃথিবী মধ্যে সকল সুসভ্য রাজত্বেই ইহা কম বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

ভারতবর্ষে বিটিশ রাজত্বে লর্ড রীপণ বাহাদুর এই স্বায়ত্বশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখন ছিল না? ছিল বৈ কি, এমন ছিল যে, ইংরাজেরা এখন যে টুক প্রবর্ত্তিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তদপেক্ষা সহস্রাংশে অধিক ছিল। হিন্দু রাজত্বের ত কথাই নাই, সে রাজত্বে বোধ করি রাজার আনা ভাগ রাজকার্য্য এই প্রণালী কর্তৃক সম্পাদিত হইত, আর মুসলমান রাজত্বেও ইহার যথেষ্ট আধিক্য ছিল। রাজধানী, কিম্বা তন্নিকটস্থ কতকটা স্থান রাজার সাক্ষাৎ শাসনাধীন থাকিত, বক্রী সমস্ত দেশ যাহাকে আজকালের দিনে মফঃস্বল বলা যায়, তাহা সমগ্রভাবে স্বয়ং দেশবাসীদিগেরই শাসনাধীন থাকিত। হুকুম রাজার, বিধিব্যবস্থা রাজার, আইন কানুন রাজার; কিন্তু সে হুকুম, সে বিধি এবং সে আইন চালাইবার ভার দেশবাসীদিগের হস্তে। কি প্রকার ভাবে তাহা চালিত হইত, অর্থাৎ রাজত্ব কি প্রকার ছিল এবং তাহার দোষ গুণ কি ছিল, তাহার বিচার করিবার স্থান ইহা নহে, এবং

তাহাতে প্রয়োজনও নাই। এ স্থলে কেবল ইহাই ব্যক্তব্য, যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসন-প্রথা সম্যকরূপে প্রচলিত ছিল।

তৎপরে ইংরাজ রাজত্ব। ইংরাজেরা যে সময়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন সে সময় ভারতবর্ষের অবস্থা বড়ই বিপন্ন। সমস্ত দেশ অশান্তি, অরাজকতা, এবং উচ্ছৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। দিল্লীর বাদসাহী তখন গতপ্রায়, একদিকে তাহার অধীনস্থ সুবা এবং নবাবেরা সমস্ত দেশটা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত, অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা নবীন জাতীয় ভাবে উদ্যুক্ত হইয়া দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে সমুদ্যত। সর্ব্বত্রই যুদ্ধ বিগ্রহ, লুটপাট, এবং অরাজকতা বিরাজমান। রাজা নাই, রাজত্ব নাই, রাজশাসনও নাই, কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কোন কার্য্য করিতে কাহার হুকুম অপেক্ষা করে না, এক প্রদেশ অপর প্রদেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, এক রাজা অপর রাজার বক্ষে ছুরীকা বসাইতে প্রস্তুত। যখন মুসলমান রাজত্বের শেষ দশায় ভারতবর্ষের এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যবান ইংরাজ সেই সময়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই যে বিচিত্র এবং জঘন্য চিত্র অবলোকন করিলেন, তাহাই তাঁহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। তাঁহারা একেবারে স্থির করিয়া লইলেন যে এই দেশ অতি অসভ্য এবং এখানকার লোকগুলাও একেবারে অপদার্থ। যদি তাঁহারা একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন,—এই বিচিত্রের [illegible] আভ্যন্তরিক ব্যাপার সমস্ত পরিদর্শন করিতেন, তাহা হইলে হয় ত অনেক ভাল জিনিষ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। কিন্তু তাহা তাঁহারা করিলেন না। নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার গরীমায় তাহাদের মস্তক ঘূর্ণায়মান, সুতরাং তাঁহাদের ধৈর্য্য কোথায়? যে জিনিষ [illegible] সে সভ্যতার অনু মোদি [illegible] ভাল হইতে পারে? বরং [illegible] তাহাদের মনের দৃঢ় বি [illegible] ভারতবর্ষের সমস্ত জিনিষই যে [illegible] অসভ্যতায় পরিপূর্ণ এবং ভারতবর্ষের লোকগুলাও যে একেবারে অপদার্থ, তাহারা আপনার মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, বিচিত্র কি? ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর অল্প দিন মধ্যেই বিধাতার লিখনে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাদের করতলস্থ হইয়া গেল। দিল্লীর বাদসাহীও গেল, বাদসাহীও গেল বাদ-অধীনস্থ নবাবেরাও একে একে লেন, এবং মহারাষ্ট্রজাতি এবং তাহাদের বলও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ইংরাজ ক্রমে ভারতের একচ্ছত্রী রাজা হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি রাজত্বের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মনে বিশ্বাস যে যাহা ভারতবর্ষীয় তাহাই অসভ্য, সুতরাং সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের সভ্যতা দেশাচার এবং রীতিনীতির অনুযায়ীক একটী অভিনব প্রকাণ্ড রাজ্য খাড়া করিলেন। যাহা করিলেন, তাহা এক হিসাবে বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা দেখিলে,—স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে অবশ্যই তাঁহার অসাধারণ নির্ম্মাণ ক্ষমতার ভূয়োসী প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু গোড়ায় ঐ

এক মস্ত ভুল করিয়া ফেলিলেন, যে যাহা ভারতবর্ষীয় তাহাই অসভ্য অতএব অবক্ষণীয়, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল, তাহাতেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলাম। রাজ্যশাসন এবং সমাজসম্বন্ধে পুরাতন বন্দোবস্ত আমাদের যাহা কিছু ছিল সে সমস্তই অদৃশ্য হই তাহার পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভ ং বহু ব্যাপারসমন্বিত একটা াবস্থ কর্ত্তৃক আমরা আষ্টেপৃ সমা ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু এই বিষম রাজনীতির শেষ ফল কি হইল? ইংরাজী শাসনপ্রণালীতে অনভিজ্ঞ বলিয়া দেশবাসীরা নূতন রাজ্যগঠন কার্য্যে রাজার কোন সাহায্যেই আসিল না, রাজার অযত্নে, নিরুৎসাহে, এবং তাচ্ছিল্যে অনতিকালমধ্যেই সকল প্রকার পূর্ব্ব অভ্যাস এবং স্বাবলম্বন বর্জ্জিত হইয়া সমাজাভ্যন্তরে অদৃশ্য এবং লীন গেল। ইংরাজেরা নিজেই স্বহস্তে স কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং দেশের লোকদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী করিবেন বলিয়া ইংরাজী শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে অনেক ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত লোক হইল, এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। উচ্চ উচ্চ যত কর্ম্ম, যাহাতে শাসন কার্য্য শিক্ষা হয় কিম্বা যাহাতে শাসনক্ষমতা প্রদর্শন করিতে হয়, সে সমস্ত কার্য্য স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় দিগের হস্তে; আর যত ছোট কর্ম্ম, চিঠী নকল করা কিম্বা হিসাব ঠিক দেওয়া, তাহাই কেবল দেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে দেওয়া হইতে লাগিল। অবশ্য সংখ্যায় তাহারাই বেশী হইল বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতাসম্বন্ধে তাহারা কিছুই নহে। কিন্তু উপরেই বলিয়াছি যে একেত কেবলমাত্র বেতনভোগী কর্ম্মচারীদ্বারায় কোন রাজ্যই সুশাসিত হইতে পারে না, তার পর যে, রাজত্বের বেশী সংখ্যক কর্ম্মচারী এরূপ অল্প ক্ষমতাপ্রাপ্ত অক্ষম লোক সে রাজত্বের শ্রেয় কোথায়? সুতরাং ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ করিলেন বটে এবং তদুদ্দেশে মহা ধুমধাম করিয়া, গাড়ী গাড়ী রিপোর্ট লিখিয়া বৎসর বৎসর ক্রোর ক্রোর টাকার শ্রাদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজত্বের সুখ্যাতি কিম্বা প্রতিষ্ঠা কিছুই হইল না। এই শতাধিক বৎসর তাঁহার রাজত্ব হইয়া গেল, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, এমন কি ইংরাজ কি নিজেই বলিতে পারেন যে তাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছে? কখনই নহে। বরঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে সকলেই কষ্টিত, সকলেই বিপদগ্রস্থ, এবং সকলেই অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে পারি, যে ইংরাজ যদি এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া দেশবাসী দিগের সাহায্যগ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকে খাতির করিতেন, তাহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, তাহাদিগকে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিয়া পায়ে ঠেলিয়া না রাখিতেন,তাহা হইলে ভারত শাসনে যে তাঁহার শোচনীয় নিষ্ফলতা ঘটিয়াছে, তাহা কিছুতেই ঘটিত না, এবং তাহা হইলে আমাদিগকেও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় সকল বিষয়ের জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না,

কিন্তু যাহা হউক অতীব সুখ এবং আহ্লাদের কথা যে এতদিন পরে ইংরাজের এ বিশ্বাসসম্বন্ধে একএকটু জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং তিনি আমাদিগকে কথঞ্চিৎ স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। লর্ড মেওর রাজত্বকালে প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট এই রাজনীতি প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতেই জেলায় জেলায় রোডসেস, এডুকেশন এবং মিউনিসিপাল ইত্যাদি কমিটি স্থাপিত হয়, এবং দেশের বিদ্বান এবং সম্ভ্রান্ত লোক বাছিয়া বাছিয়া সেই সমস্ত সভ্য নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু সে সময় হইতে লর্ড রীপণ রাজত্বের আগমন পর্য্যন্ত এই রাজনীতির যথেষ্ট রূপ উন্নতি কিম্বা সম্প্রসারণ হইতে পারে নাই। তাহার কারণ, গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ ইংরাজকর্ম্মচারী সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ। এই কর্ম্ম ভয় করেন যে, স্বায়ত্বশাসনপ্রথা প্রচলিত হইলেই তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইবে এবং সেই জন্য যাহাতে দেশবাসীরা ইহা প্রাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ের তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই অযথা প্রতিরোধ এই রাজনীতির উন্নতি পক্ষে এতদিন একটী ভয়ানক অন্তরায় স্বরূপ কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু যাহা হউক লর্ড রীপণ বাহাদুর রাজত্ব গ্রহণ করিয়াই একটী সুস্পষ্ট অবয়বের সহিত ইহা প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রতিরোধ এক কপর্দ্দকও হ্রাস হয় নাই; তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ গবর্ণমেণ্টের হস্তরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সহস্র অবমাননা এবং তীরস্কার সহ্য করিয়াও লর্ড রীপণ যথাসাধ্য আপনার প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবমতে সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে যতগুলি প্রদেশ আছে, তাহার এক একটীর জন্য দুইটী করিয়া আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। প্রথম মিউনিসিপাল আইন, অর্থাৎ প্রদেশ মধ্যে যে সমস্ত বর্দ্ধিষ্ণু স্থানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত আছে কিম্বা হইবে, তাহার জন্য আর দ্বিতীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আইন, অর্থাৎ প্রদেশ মধ্যে যত জেলা আছে তাহার জন্য। উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি অপরাপর প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এই দুই আইন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার এ পর্য্যন্ত কেবল মিউনিসিপাল আইন হইয়াছে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আইন এখনও বাকি আছে। বোধ হইতেছে, এই শীতঋতুতে তাহা হইয়া যাইবে,

স্বায়ত্বশাসন কাহাকে বলে তাহা উপরে বলিয়াছি, এবং ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় রাজত্বকালেই যে তাহা সম্যক্‌রূপে প্রচলিত ছিল তাহাও কাহার অবিদিত নাই। ইংরাজরাজত্বকালে তাহা উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এত দিন পরে তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। জিনিষটা চিরকালই এক, কিন্তু প্রভেদ কেবল পরিমাণ এবং প্রণালীতে। অর্থাৎ এই স্বায়ত্বশাসনক্ষমতা লইয়া হিন্দু এবং মুসলমান রাজত্বকালে আমরা যে যে প্রকৃতির কার্য্য করিতাম, ইংরাজ রাজত্বকালেও সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা সেইরূপ প্রকৃতির কার্য্য করিব। কিন্তু পূর্ব্বে তাহার পরিমাণ অনেক বেশী ছিল, এবং তাহার প্রণালীও সর্ব্বতোভাবে আমাদের দেশের রীতি-

নীতির অনুযায়ীক ছিল, আর এখন যাহা আমরা পাইতেছি, তাহার পরিমাণ অল্প এবং তাহার প্রণালীও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন।

প্রথমতঃ পরিমাণ। পরিমাণ যে বাস্তবিকই অত্যন্ত কম তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রস্তাবিত দুই আইন মতে আমাদিগকে প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত দুইটা ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, -

প্রথম—মিউনিসিপালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে সমস্ত রাস্তা ঘাট প্রস্তুত এবং তাহার মেরামত করা, এবং

দ্বিতীয় গ্রাম্য স্কুল, এবং ডিস্পেন্সরি ইত্যাদি স্থাপন এবং তত্ত্বাবধারণ করা, এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার উপায় বিধান করা।

কিন্তু পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে, এই দুইটী কার্য্য সমগ্র রাজকার্য্যের কত টুকু অংশ আমরা বোধ করি লক্ষাংশের এক অংশও হইবে না। রাজত্বের যে সমস্ত আসল কর্ম্ম, আইন কানুন করা, শাসন এবং বিচারকার্য্য সম্পন্ন করা, আয় ব্যয় নির্দ্দেশ করা এবং তাহার হিসাব দেখা, কর্ম্মচারী নিয়োগ করা এবং তাহাদের কার্য্যের উপর তত্ত্বাবধারণ করা—সে সমস্তের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব থাকিবে না; কোথা দিয়া তাহা হইতেছে কে করিতেছে, তাহা আমরা কিছু জানিতেও পারিব না। কেবল, রাজা বলিয়া দিবেন যে ঐ রাস্তা ঘাটগুলা মেরাৎ কর, আমরা তাহাই করিব। এই স্বায়ত্বশাসনক্ষমতা আমরা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছি, এবং ইহাই আমাদের দেওয়া হইতেছে বলিয়া ইংরাজেরা আমাদিগের প্রতি যেন কি অসীম দয়া এবং উদারতা প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া সমস্ত ভারতবর্ষটা তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

তৎপরে প্রণালীও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ ছিল, গ্রাম মধ্যে পাঁচ বিশ্বা সাত ব্যক্তি প্রধান বলিয়া মান্য হইত। তাহারাই স্বায়ত্বশাসনের সমস্ত কার্য্য করিত। এক দিকে [illegible] জমীর তকরার হইতে পিতা পুত্রে [illegible] বাদ পর্য্যন্ত, অন্য দিকে খাজানা আদায়, বৃক্ষরক্ষা, রাস্তা প্রস্তুত, পুষ্করিণী এবং কূপ খনন ইত্যাদি যত কিছু প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্য্য সে সকলই তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। তাহাদের আদালত ছিল গ্রামস্থ কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের চণ্ডীমণ্ডপ নচেৎ কোন ছায়াবিশিষ্ট বট বৃক্ষতলা, তখনও সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া যোড়হস্তে উমেদারী করিতে হইত না। কিন্তু এখন যে প্রণালীতে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। এক এক স্থানে একএকটী কমিটী হইবে, সে কমিটির স্থান হইবে সবকারি কাছারি আর তাহারা হর্ত্তাকর্ত্তা হইবেন সাক্ষাৎ যমোপম জেলার মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর। কার্য্যের নিয়ম সমস্ত ইংরাজীকেতা এবং ইংরাজীভাষায় লিখিত; সভায় কথাবার্ত্তা সমস্ত ইংরাজীতে, সভার কার্য্য বিবরণ লিখিত হইবে তাহাও ইংরাজীতে। এই প্রণালীকে আমরা নিন্দা করি না; বরঞ্চ সকল দিক বিবেচনা করিয়া বোধহয় ইহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই বলিতে হয়;

কেননা ইহার বাঁধুনি বেশ আছে এবং ইহার অনুযায়ী কার্য্য হইলে ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার হইবার কম সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এবং সেই জন্য ইহাতে শীঘ্র আমাদের অভিজ্ঞান কিম্বা সহানুভূতি জন্মিবে না। যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন, ইংরাজী চালচলন বুঝিতে পারেন, তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশের সাধারণ লোক, যাহাদিগকে এই স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহারা এই প্রণালী সহজে বুঝিতে পারিবে না। এবং তাহা হইলেই ইহা হইতে আমরা শীঘ্র কোন প্রকৃত উপকার প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইব না।

কিন্তু যাহা হউক, পরিমাণ কম হউক, কিম্বা প্রণালীই নূতন এবং আপাততঃ অবোধ্য হউক, আমাদের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যে টুকু ক্ষমতা এতদিন পরে ইংরাজ আমাদিগকে দিতে রাজী হইয়াছেন, এতটুকুই বা আমরা পাই কোথা এবং দেয়ই বা কে? বরঞ্চ আমরা বলি এতকাল পরে গবর্ণমেণ্ট যখন এই স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা ভারতবাসীদিগকে দেওয়া উচিত কিম্বা দেওয়ার প্রয়োজন এই কথাটী মানিয়াছেন, তখন তাহাই আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য মনে করিয়া লওয়া চাহি। অদ্য বীজ বপন হইল, কল্য অঙ্কুর হইবে, পরশ্ব পল্লবিত হইবে, তাহার পর দশ দিন পরে বৃক্ষ হইবে আমাদের এক্ষণে এইরূপ আশা করা উচিত এবং এইরূপ আশা করিয়া, যতটুকু ক্ষমতা এক্ষণে পাইতেছি তাহাকেই "দোণা হেন মুখ" করিয়া মস্তকে বহন করা উচিত। এই স্বায়ত্বশাসনক্ষমতা প্রজাবর্গের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষমতা, যে দেশের প্রজাদিগের যে পরিমাণে ইহা আছে সে দেশের প্রজারা সেই পরিমাণে সুখী এবং মনুষ্য সমাজোচিত সকল প্রকার উৎকৃষ্ট সত্বাধিকার এবং স্বাধীনতা বিশিষ্ট। ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ যে এত সুখী এবং উন্নত তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাহাদের এই স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া। তাহারাই রাজদ্বার চালায়, তাহারাই রাজশাসনপ্রণালীর নিয়ামক, এবং তাহারাই দেশের সকল প্রকার উন্নতি এবং ঐশ্বর্য্যের প্রবর্ত্তক। রাজা তাহাদিগকে অমান্য করিতে পারেন না, রাজমন্ত্রীরা তাহাদিগকে অবহেলা করিতে পারেন না, রাজ্যের কোন একটী ক্ষুদ্রতম কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের অনভিমতে হইতে পারে না। তাহাতেই না তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছে? তাহাতেই না তাঁহারা অদ্য জগন্মান্য, পৃথিবীর পূজ্য, এবং সসাগরা ভূমণ্ডলের রাজা? অতএব যে ক্ষমতা আছে বলিয়া ইংলণ্ডের লোকের এতদূর সুখৈশ্বর্য্য হইয়াছে, সেই ক্ষমতা অদ্য আমরা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছি। যাহা পাইতেছি তাহা অতি সামান্য বটে পরমাণুমাত্র; কিন্তু একবার যখন তাহা পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহার পরিমাণ ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে যে, ভারতবর্ষও একদিন ইংলণ্ডের মত আভ্যন্তরিক সুখৈশ্বর্য্যে এবং স্বত্ব-স্বাধীনতায় পরিপূর্ণ হইয়া সগৌরবে মস্তকোত্তলন করিতে না পারিবে? তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; মঙ্গলময় জগদীশ্বরের রাজত্বে কিছুই অসম্ভব নহে।

অতএব যে স্বায়ত্বশাসনক্ষমতাটুকু আমরা এক্ষণে পাইতেছি, তাহা সাদরে আমাদের গ্রহণ করা উচিত, এবং পরে যাহাতে আমরা তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করাইয়া লইতে পারি, তদ্বিষয়ে এখন হইতে চেষ্টা করা উচিত। সেইটাই এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এবং সেই কর্ত্তব্যটী এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

প্রথম, এই স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা কাহাকে বলে এবং তাহার কতটুকু আমরা এক্ষণে পাইতেছি তাহা আমাদিগকে আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে সম্যকরূপে বুঝাইতে হইবে, দ্বিতীয়, যে ক্ষমতাটুকু আমরা পাইতেছি, সম্পূর্ণরূপে যাহাতে তাহার সদ্ব্যবহার হয় তাহার উপায় করিতে হইবে, এবং তৃতীয়, বর্ত্তমানে আমাদের এতৎসম্বন্ধে দক্ষতা এবং পারদর্শিতা দেখাইয়া ভবিষ্যতে তাহা আরও বেশী [illegible]। প্রাপ্ত হওয়া যায় তজ্জন্য মৃদু অথচ নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি ঠিক এই তিনটী উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত এখন হইতে এই আমরা কার্য্যারম্ভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশের—ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং উদ্ধার যে অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য তাহা দিব্যচক্ষে আমরা দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু আমাদের উপরোক্ত উদ্দেশ্যত্রয় প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে গবর্ণমেণ্ট যে মিউনিসিপাল এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সম্বন্ধে আইন জারি করিতেছেন, তাহা আমাদিগকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হইয়া জারি হইতে বসিয়াছে, এই সময় হইতেই সে আইনটী ভাল করিয়া আমাদের বুঝা উচিত। এই উদ্দেশ্যে নিম্নে আমরা তাহা হইতে কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় কথা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের পাঠক বর্গ বিশেষ উপকৃত হইবেন। কিন্তু এস্থলে একটা কথা বলিয়া দিই যে, সাময়িক পত্রে একটী সামান্য প্রবন্ধ লিখিয়া একখানা আইন বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় না বিশেষ যত্নবান হইবেন, ততদিন কোন বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ স্থানে বক্তৃতা করা আমাদের দেশে এবং সমাজে আজকাল একটী চলিত প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছে, আমরা প্রস্তাব করি যে, আমাদের কৃতবিদ্যেরা দল বাঁধিয়া প্রতি গ্রামে গ্রামে এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া লোক বুঝাইয়া বেড়ান।

নূতন মিউনিসিপাল আইনের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

(আইন নং ৩ বেঙ্গল কাউনসিল ১৮৮৪)

১। নিম্নলিখিত সর্ত্তে নগর কিম্বা পল্লী বিশেষে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইতে পারে—

প্রথম—যে নগরের অধিবাসী সংখ্যা ৩০০০ হাজারের ন্যূন না হইবে, এবং

যাহার প্রত্যেক বর্গ মাইলে ১০০০ হাজারের কম লোক না হইবে।

দ্বিতীয়—যে নগরের সমগ্র অধিবাসীদিগের মধ্যে অন্ততঃ বার আনা লোক কৃষীব্যবসায়ী না হইবে।

২। ১ মাইলমাত্র ব্যবধান থাকিলে দুই কিম্বা ততোধিক পল্লী একত্রিত করিয়া একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইতে পারিবে।

৩। মিউনিসিপালিটির যে কমিটি হইবে, তাহাতে কতকগুলি কমিশনর কার্য্য করিবেন, তাহা প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির জন্য, গবর্ণমেণ্ট স্থিরীকৃত করিয়া দিবেন।

৪। মিউনিসিপাল কমিটির কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কিম্বা কয় ওয়ার্ডে প্রত্যেক মিউনিসিপালিটি বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে কয় জন কমিশনর নিযুক্ত হইবেন, কমিশনর কিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে, কোন কোন অবস্থায় ট্যাক্সদাতাগণ কমিশনর নির্ব্বাচন করিতে কিম্বা কমিশনরস্বরূপ নির্ব্বাচিত হইতে সক্ষম হইবেন, এতৎসম্বন্ধে নিয়মাদি গবর্ণমেণ্ট করিবেন, এবং সময়মত গেজেটে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৫। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অবস্থা উপস্থিত থাকিলে নির্ব্বাচকের ক্ষমতা হইবে।

প্রথম—প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ, যিনি বর্ত্তমান নির্ব্বাচন সময়ের পূর্ব্বে অন্ততঃ ১ বৎসর মিউনিসিপালিটির ভিতর বাস করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—যিনি গত এক বৎসর হইতে মিউনিসিপালিটিতে কোন প্রকার ট্যাক্সের হিসাবে একুণে ১৷৷ টাকা দিয়াছেন।

তৃতীয়—কিম্বা যিনি নিজে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, কিম্বা উকীল, কিংবা মোক্তার, কিম্বা মাসিক ৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ বেতনভোগী এবং একটী অবিভক্ত পরিবারের (যে পরিবারের কেহ এক জন বৎসরে ১। কিম্বা ততোধিক ট্যাক্স দিয়া থাকেন) এক জন অংশীদার হইবেন।

৬। যিনি নির্ব্বাচক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি নিজেও কমিশনর স্বরূপ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

৭। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মাদি করিবেন তদনুযায়ীক কোন মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রাপ্ত করাইবার যদি আবশ্যকীয় সংখ্যক কমিশনর নির্ব্বাচন করিয়া না লইতে পারেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আপন ইচ্ছামত কমিশনর নিযুক্ত করিবেন।

৮। সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে নিম্নলিখিত*

জেলা	মিউনিসিপালিটী
খুলনা	১। চন্দুরিয়া
ঐ	২। দেবহাটা
দার্জ্জিলিং	৩। দার্জ্জিলিং
হাজারিবাগ	৪। হাজারিবাগ
সিংভূম	৫। চাইবাসা
বাকরগঞ্জ	৬। নলচিটী
ঐ	৭। ঝালোকাঁতি
চট্টগ্রাম	৮। কক্সবাজার
মজফরপুর	৯। লালগঞ্জ
ঐ	১০। সীতামারী
দরভাঙ্গা	১১। রোসড়া

মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত হইবে না। তথায় সমস্ত কমিশনরগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযোজিত হইবেন। ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে যে কোন মিউনিসিপালিটিকে এই নিয়ম হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন।

৯। প্রত্যেক কমিশনর নিযুক্তির তারিখ হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত পদস্থ থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তিনি পদত্যাগ করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত কোন না কোন ত্রুটি কিম্বা অপরাধ হইলে তিনি পদচ্যুত হইতে পারিবেন।

প্রথম—যদি বিনা অনুমতিতে ক্রমান্বয়ে ৬টী সভাধিবেশনে উপস্থিত না হন,

দ্বিতীয়—কিম্বা যদি তাহার চরিত্রগত কোন প্রকার জঘন্য দোষ সপ্রমাণিত হয়,

তৃতীয়—কিম্বা জানিন হইতে পারে না এমন কোন দোজদারি অপরাধে যদি তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হন, কিম্বা আইনমত যদি তিনি দেউলিয়া বলিয়া চিহ্নিত হন।

১০। কমিটির অধিবেশনে অনুপস্থিতির জন্য কিম্বা দেউলিয়া বলিয়া চিহ্নিত হইবার জন্য যে কমিশনর একবার পদচ্যুত হইয়াছেন কিম্বা যিনি নিজে স্ব ইচ্ছায় একবার কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পুনঃ বার নিযুক্ত কিংবা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

১১। অপরাপর নিম্নলিখিত † মিউনিসিপালটীর চেয়ারম্যানগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযোজিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোন মিউনিসিপালিটীবিশেষকে এই নিয়ম হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন অপরাপর মিউনিসিপালিটিতে কমিশনরেরা

চাম্পারণ	১২। বেতিয়া
ভগলপুর	১৩। কাহল গাঁ
কটক	১৪। জাজপুর
ঐ	১৫। কেন্দ্রাপাড়া

জেলা	মিউনিসিপালিটী
বর্দ্ধমান	১। ডাইহাট
হুগলি	২। উত্তরপাড়া
চব্বিশ পরগণা	৩। কলিকাতা সুবর্ব্ব
ঐ	৪। বারইপুর
নদীয়া	৫। শান্তিপুর
ঐ	৬। বীরনগর (উলা)
ঐ	৭। মহেশপুর
মুর্শিদাবাদ	৮। কাদি
দারজিলিং	৯। দারজিলিং
হাজারিবাগ	১০। হাজারিবাগ
ঐ	১১। ছাতরা
লোহারডাঙ্গা	১২। রাঁচি
সিংভূম	১৩। চাইবাসা
মানভূম	১৪। পুরুলিয়া
চট্টগ্রাম	১৫। কক্স বাজার
পাটনা	১৬। পাটনা
গয়া	১৭। গয়া
সাহাবাদ	১৮। সসারাম
ঐ	১৯। ভবুয়া
মোজাফরপুর	২০। সীতামারী
দরভাঙ্গা	২১। দরভাঙ্গা
ঐ	২২। মধুবনী
সারণ	২৩। সেওয়ান
চম্পারণ	২৪। বেতিয়া
কটক	২৫। জাজপুর
ঐ	২৬। কেন্দ্রাপাড়া

আপনাদিগের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন, কিংবা বিশেষ সভা করিয়া (যে সভাতে অন্ততঃ পূর্ণ সংখ্যা কমিশনরদিগের মধ্যে তৃতীয়াংশ দুই অংশ উপস্থিত থাকিবেন) গবর্ণমেণ্টকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় নিযুক্ত কোন চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

১২। প্রত্যেক চেয়ারম্যান (নির্ব্বাচিত কিংবা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত) ৩ বৎসর পর্য্যন্ত পদস্থ থাকিতে পারিবেন, এবং তৎপরে পুনরায় নিযুক্ত হইতে পারেন। যত দিন তিনি পদস্থ থাকিবেন, এবং কমিশনরের যত কিছু সম্বাধিকার সে সমস্তই তাঁহার থাকিবে। কমিশনরগণ বিশেষ সভা করিয়া, (যে সভায় অন্ততঃ তৃতীয়ের দ্বিতীয়াংশ কমিশনর উপস্থিত থাকিবেন) তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান কমিটির মুখপাত্রস্বরূপ হইবেন, কিন্তু তিনি কখন কমিশনরদিগের অসম্মতিক্রমে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে তিনি সময়ে সময়ে আপন ক্ষমতা ভাইস চেয়ারম্যানের হস্তাস্তরিত করিতে পারিবেন।

১৩। ভাইস চেয়ারম্যান সকল মিউনিসিপালিটিতেই এক নিয়মে নিযুক্ত হইবেন। কমিশনরদিগের তৃতীয়ের দুই অংশ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদেরই মধ্যে একজনকে মনোনীত করিবেন। তিন বৎসর ভাইস-চেয়ারম্যান পদস্থ থাকিবেন; তৎপরে আবার নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ভাইস-চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করিতে হইলেও আবশ্যক তৃতীয়ের দুই অংশ কমিশনর উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সভাতে তাহা করিতে হইবে।

১৪। কমিশনরগণ সভা করিয়া অনুমতি দিলে চেয়ারম্যান কিম্বা ভাইস চেয়ারম্যান মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে খরচা স্বরূপ কিছু বেতন পাইতে পারিবেন।

১৫। মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে যত রাস্তা, পুল, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ, পয়নালা ইত্যাদি থাকিবে, যাহা গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অন্য কাহারও খাস নহে, তাহা এবং তৎসংসৃষ্ট যত প্রকার মাল মসলা যন্ত্রাদি সে সমস্ত মিউনিসিপালিটির সম্পত্তি হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার দিয়া কোন রাস্তা কিম্বা অপর কোন সম্পত্তি মিউনিসিপালিটির হস্ত হইতে হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন। যদি সে সম্পত্তি মিউনিসিপালিটির ব্যয় হইতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে কমিশনরদিগের সম্মতি লইতে হইবে।

১৬। মিউনিসিপালিটী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার সম্মতিক্রমে কোন রাস্তা কিম্বা উপরোক্ত প্রকারের কোন সম্পত্তি নিজ হস্তে লইতে পারিবেন। তখন হইতে সে সম্পত্তি মিউনিসিপালিটির নিজ সম্পত্তি হইবে।

১৭। মিউনিসিপালিটির মধ্যে যে কোন হাসপাতাল, ঔষধালয়, স্কুল, বিশ্রাম সরাই, হাট এবং বাজার থাকুক (যাহা অপর কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে) গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে মিউনিসিপালিটী লইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের এ সমস্ত লওয়া না লওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হুকুম চলিবে না; মিউনিসিপালিটির ইচ্ছাক্রমে এবং তাঁহাদেরই প্রযুক্তসর্ত্তে একার্য্য হইবে।

১৮। সচরাচর মিউনিসিপাল কমিটির অধিবেশন মাসে একবার করিয়া হইবে। সে সভা হয় মিউনিসিপালিটির আফিসে কিম্বা সুবিধামত অন্য কোথাও বসিতে পারে।

১৯। এই মাসিক অধিবেশন ভিন্ন অন্যূন ৩ জন কমিশনর দস্তখত করিয়া পত্র লিখিলে মধ্যে মধ্যে বিশেষ অধিবেশনও হইতে পারে।

২০। চেয়ারম্যান সকল অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করিবেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সে কার্য্য করিবেন। আর উভয়েই অনুপস্থিতি থাকিলে সভার উপস্থিত কমিশনরেরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সভাপতি করিয়া লইতে পারেন।

২১। উপস্থিতের মধ্যে বেশী সংখ্যক কমিশনরদিগের "ভোট" লইয়াই কার্য্য হইবে। যদি সম্মতি এবং অসম্মতির সংখ্যা উভয় সমান হয়, তাহা হইলে চেয়ার যে দিকে আপন সম্মতি দিবেন, সেই দিকের মতই প্রবল হইবে।

২২। যে মিউনিসিপালিটির কমিশনর সংখ্যা ১৫ জনমাত্র তথায় ৫ জন কমিশনর উপস্থিত না থাকিলে কোন সভাই হইবে না। অন্যান্য মিউনিসিপালিটিতে সভার উপস্থিত কমিশনরদিগের সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যার অন্ততঃ তৃতীয়ের দুই অংশ হওয়া চাহি।

২৩। আবশ্যকীয় সংখ্যক কমিশনর উপস্থিত না হইলে মিটিং স্থগিত করা হইবে, পূর্ব্বে এবং ৩ দিন নটিস দিয়া পুনরায় নূতন করিয়া তাহার অধিবেশন হইবে। এরূপ স্থগিত মিটিংতে যে কোন সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হইলেই কার্য্য চলিবে।

২৪। প্রত্যেক সভায় যে কার্য্য হইবে একখানি পুস্তকে সভাপতির দস্তখতের সহিত তাহার বিবরণ লিখিত হইবে। টাক্সদাতা সকলেই এই পুস্তক ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবেন।

২৫। চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান ব্যতীত অধীনস্থ কি কি কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে যথা—ইঞ্জিনিয়র, ওভারসিয়ার, কেরাণী, ট্যাক্স কলেক্টর ইত্যাদি, এবং তাহাদের প্রত্যেককে কত বেতন দেওয়া হইবে সে বিষয় কমিশনরেরা সভা করিয়া স্থির করিবেন। তবে নিযুক্তি সম্বন্ধে ২০ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত চেয়ারম্যানের ক্ষমতা থাকিবে, তদূর্দ্ধে কমিটি স্বয়ং করিবেন। শেষোক্ত কর্ম্মচারী দিগকে পদচ্যুত করিতে হইলেও কমিটির সম্মতি আবশ্যক।

২৬। কমিশনরেরা আপন মিউনিসিপালিটিকে আবশ্যকমত কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করিতে পারিবেন এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডেতে অন্ততঃ তিন জন মেম্বর নিযুক্ত করিবেন। এই মেম্বর কমিশনর কিংবা অপর লোক উভয়েই হইতে পারিবেন। সভা করিয়া প্রত্যেক ওয়ার্ডের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, এবং নির্ব্বাচন প্রথা অনুযায়িক ও এই ওয়ার্ড কমিটির মেম্বরেরা মনোনীত হইতে পারিবেন। কমিশনরেরা সেই নির্ব্বাচনের নিয়মাদি স্থির করিয়া দিবেন।

২৭। এই ওয়ার্ড কমিটিরও আবার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হইবে। সেই কমিটির মেম্বরেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে কোন দুই ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্যদ্বয়ের জন্য মনোনীত করিয়া লইবেন।

২৫। এই ওয়ার্ড কমিটি সমস্ত সাধরণ মিউনিসিপাল কমিটির অধীনস্থ থাকিবে। কমিশনরেরা কোন কোন কার্য্যবিশেষে আপনাদিগের ক্ষমতা এই ওয়ার্ড কমিটির মেম্বরদিগকে দিতে পারিবেন। তাহাই তখন তাঁহাদের কার্য্য হইবে।

২৬। সমস্ত মিউনিসিপালিটির উপরেই গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি থাকিবে।

১ম,—চেয়ারম্যান মনোনীত করা কিংবা তাঁহাকে পদচ্যুত করা, চেয়ারম্যান কিংবা ভাইস চেয়ারম্যানকে কোন রূপ বেতন দেওয়া এবং আপন কর্ম্মচারীদিগকে পেনসন কিংবা গ্র্যাচুইটী দেওয়া সম্বন্ধে নিয়ম করা—এই সমস্ত বিষয়েই কমিশনরদিগকে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

২য়,—সকল সভারই কার্য্য বিবরণ এক কাপি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩য়,—মাসিক ২০০ শত টাকা কিংবা তদূর্দ্ধ বেতনের কোন কর্ম্মই গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি ভিন্ন সৃষ্টি করা কিংবা উঠাইয়া দেওয়া হইতে পারিবে না।

৪র্থ,—মাসিক ১০০ শত টাকা কিংবা তদূর্দ্ধ বেতনভোগী কোন কর্ম্মচারীই ডিভিসনাল কমিশনরের মঞ্জুরি ভিন্ন নিযুক্ত কিংবা ডিস্‌মিস্ হইবে না।

৫ম,—জেলার মাজিষ্ট্রেট কিংবা সব-ডিভিসনের মাজিষ্ট্রেট কিংবা তাঁহাদের হুকুম মত অন্য কোন ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করিতে কিংবা তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন তাহারা মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ সকল প্রকার কার্য্য দেখিতে এবং মিউনিসিপালিটী সংবন্ধীয় যে কোন কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন।

৬ষ্ঠ,—ডিভিসনাল কমিশনর কিংবা জেলার মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে মিউনিসিপালিটির কোন কার্য্যবিশেষ দ্বারা সাধরণের কোন বিষম ক্ষতি কিংবা অসুবিধা হইতেছে কিংবা তদ্দ্বারা সাধারণের শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, কিংবা যদি এরূপ তাঁহারা বিবেচনা করেন যে মিউনিসিপালিটির কোন কার্য্য আইনমত তাহার ক্ষমতার অতীত হইতেছে, তাহা হইলে লিখিত হুকুমদ্বারা সে কার্য্য অবরোধ করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ করিবার আবশ্যক হইলে উক্ত কমিশনর কিংবা মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ আপন হুকুমের এক নকল গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রাপ্ত হইয়া বরাবরের জন্য কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সে হুকুম বাহাল রাখিবেন, নচেৎ তাহা তখনই নামঞ্জুর করিয়া দিবেন।

৭ম,—যদি ডিভিসনাল কমিশনর কিংবা জেলার মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট এরূপ অবগত হয়েন যে, কোন মিউনিসিপালিটী তাঁহাদের আইনমত নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করিতেছেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সে কর্ত্তব্যকর্ম্ম

করিতে লিখিত হুকুম দিবেন, এবং তাহা করিবার জন্য একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।—যদি মিউনিসিপালিটী উক্তকার্য্য সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মিউনিসিপালিটির খরচে তাহা করিতে হুকুম দিবেন। মিউনিসিপালিটিকে সে খরচ বিনা ওজরে দিতে হইবে যদি না দেন, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সে খরচা দেওয়াইবেন।

৮ম,—যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিবেচনা করেন যে, কোন মিউনিসিপাল আইনমত দক্ষতার সহিত আপনাদিগের কার্য্য করিতে পারিতেছে না কিম্বা আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কার্য্য করিতেছেন কিংবা ইচ্ছা করিয়া আপন কার্য্যে অবহেলা করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত গবর্ণমেণ্ট, গেজেটে রীতিমত ইস্তাহার দিয়া প্রচার করিবেন যে সেই মিউনিসিপালিটী "অযোগ্য" এরূপ ঘটিলে সে মিউনিসিপালিটী আর সাব্যস্ত থাকিবে না, তাহার সকল কমিশনরগণ পদচ্যুত হইয়াছেন এরূপ বুঝা যাইবে। তাঁহাদের ক্ষমতা তখন গবর্ণমেণ্টের হুকুমে অন্য কাহারও হস্তান্তরিত হইবে এবং তাঁহাদের সকল প্রকার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হইবে।

এই অযোগ্যতা কিছু কালের জন্য হইতে পারে—তাহার সময় নিরূপণ গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিবেন। এবং সে সময় অতিবাহিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে আবার সেই মিউনিসিপালিটিকে পূর্ব্ববৎ সাব্যস্ত করিতে পারিবেন। তখন আবার পূর্ব্বোক্তভাবে কমিশনর, চেয়ারম্যান ইত্যাদি নির্ব্বাচিত কিংবা নিযুক্ত হইতে পারিবে। যে কমিশনরেরা একবার পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনঃ নিযুক্ত কিংবা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

২৭। মিউনিসিপাল আইন অনুযায়ীক সকল প্রকার ট্যাক্স এবং জরিমানা ইত্যাদি এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সকল প্রকার টাকা এতদ্ভিন্ন লইয়া মিউনিসিপাল "ফণ্ড" হইবে। এই "ফণ্ড" কমিশনরদিগের হস্তে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় অর্পিত থাকিবে। অর্থাৎ তাঁহারাই ইহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইহা হইতে খরচ পত্র করিবেন।

২৮। মিউনিসিপাল ফণ্ডের বাৎসরিক যে খরচ হইবে, তাহা নিম্ন লিখিত রূপে হইবে—

১ম,—যদি মিউনিসিপালিটির ঋণ থাকে, তাহার সুদ,

২য়,—নিজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন পেনসন ইত্যাদি,

৩য়,—মিউনিসিপালিটির হিসাব তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যে খরচ হইবে। এই খরচ মোট বাৎসরিক আয়ের শতকরা ২ টাকা হিসাবের অপেক্ষা অধিক হইবে না।

২৯। সর্ব্ব প্রথমে উপরোক্ত তিন প্রকার খরচের বন্দোবস্ত করিয়া যে টাকা থাকিবে তদ্দ্বারা মিউনিসিপালিটির অধীনে যতগুলি রাস্তা, পুল, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ, পয়নালা এবং পায়খানা বর্ত্তমান আছে তাহা মেরামত করিতে হইবে, এবং সাধা-

বণতঃ মিউনিসিপালিটী যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহার উপায় করিতে হইবে।

৩২। যদি উক্ত মেরামত কার্য্যের আবশ্যকীয় টাকার অতিরিক্ত কিছু টাকা থাকে, তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে নিম্নলিখিত কোন না কোন কার্য্য করা হইবে।

১ম, - নূতন রাস্তা ঘাট, কূপ, পয়নালা ইত্যাদির নির্ম্মাণ কিম্বা এসমস্ত যাহা আছে তাহার উন্নতিসাধন।

২য়, -সহরের প্রয়োজনীয় জলের বন্দোবস্ত করা, কিম্বা রাস্তায় আলো দেওয়া এবং জলসেচন করা।

৩য়, - মিউনিসিপালিটির কার্য্য সম্পাদনার্থ কোন প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা সংরক্ষণ করা।

৪র্থ,—সাধারণ সুখ, সুবিধা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কোন প্রকার কার্য্য করা।

৫ম,—স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ কিংবা সংরক্ষণ, কিংবা স্কুলের সমস্ত কিংবা আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা।

৬ষ্ঠ,—হাঁসপাতাল এবং ঔষধালয় স্থাপন এবং সংরক্ষণ করা।

৬ম,—ইংরাজী পাচনা প্রথার (টিকা) প্রবর্ত্তন কিংবা সম্প্রসারণ করা।

৮ম,—অগ্নিনির্ব্বাণকারী কল সংরক্ষণ করা।

৯ম,—সাধরণতঃ মিউনিসিপাল আইনের অভিমত অন্য কোন প্রকার কার্য্য করা।

৩১। মিউনিসিপালিটির হিসাব কিতাবের সমস্ত বহি খাতা সকল ট্যাক্সদাতাই দেখিতে পারিবেন।

৩২। মিউনিসিপালিটির হিসাব যে রকম প্রণালীতে রাখিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার নিয়মাদি করিয়া দিবেন, এবং সে হিসাব প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টের নিযোজিত কোন এক ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইবে।

৩৩। সকল মিউনিসিপালিটিই সময়ে সময়ে সভা করিয়া আপনাপন সীমার মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকার ট্যাক্সের মধ্যে কোন এক প্রকার জারি করিতে পারিবেন।

১ম,—ব্যক্তির উপর—মিউনিসিপালিটির মধ্যে তাহার সম্পত্তির (বাড়ী কিংবা জমীর) অবস্থা দেখিয়া। কিন্তু এই ট্যাক্স বাৎসরিক ৮৪ টাকার উর্দ্ধ হইবে না।

২য়, -সম্পত্তির (বাড়ী কিম্বা জমীর) উপর—সেই সম্পত্তির বাৎসরিক আয় বিবেচনা করিয়া। এই ট্যাক্স উক্ত সম্পত্তির বাৎসরিক সম্পূর্ণ আয়ের শতকরা ৭॥ টাকার উর্দ্ধ হইবে না। কেবল ঢাকা এবং দার্জ্জিলিং মিউনিসিপালিটীদ্বয়ে এই সীমা শতকরা দশ টাকার উর্দ্ধ হইবে না। যে সম্পত্তির আয় বাৎসরিক ৬ টাকার কম, তাহাতে এই ট্যাক্স একেবারেই বসিবে না।

৩৪। উপরোক্ত দুই প্রকার ট্যাক্স ভিন্ন সকল মিউনিসিপালিটিই সভা করিয়া আপনাপন সীমার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি ট্যাক্স জারি করিতে পারিবেন—

১ম,—হস্তী, উট, ঘোড়া, টাটু, ইত্যাদি এবং দুই কিংবা চারি চাকাবিশিষ্ট সকল প্রকার চড়িবার গাড়ীর উপর।

২য়,—গরুর গাড়ীর উপর।

৩য়,—কোন ঘাটের খেওয়া; কিংবা (গবর্ণমেণ্টের হুকুম লইয়া) কোন পাকা

রাস্তা কিংবা পুল পার হইবার জন্য খেওয়া।

৩য়,—ব্যবহারীয় জলের উপর—যদি মিউনিসিপালিটী খরচ করিয়া সেই জল প্রদানের কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। যে রাস্তার ধারে এই জল প্রাপ্য তথাকার অধিবাসীদিগের উপর এই ট্যাক্স তাহাদের সম্পত্তির বাৎসরিক মোট আয়ের শতকরা ৬ টাকার বেশী হইবে না। আর যে রাস্তায় জল প্রাপ্য নহে তথাকার অধিবাসীদিগের জন্য এই সীমা শত করা ৫ টাকার উর্দ্ধ হইবে না।

৪র্থ,—রাস্তায় প্রদত্ত আলোর উপর—সম্পত্তির বাৎসরিক মোট আয়ের শতকরা ৩ টাকার উর্দ্ধ নহে।

৬ষ্ঠ,—পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য।

উপরে যাহা কিছু বলা গেল, তদ্ভিন্ন মিউনিসিপাল আইনে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে, অর্থাৎ কি করিয়া ট্যাক্স জারী এবং আদায় করিতে হইবে, কি করিয়া জল এবং আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কি কি উপায়ে সহরের স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আইন পাঠ করিয়া সে সমস্ত কথা অবগত হওয়া চাহি। মোটের উপর মিউনিসিপাল আইন জিনিষটা কি এবং তদ্দ্বারা আমরা কোন কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলাম এবং কি প্রণালীতেই বা আমাদের কার্য্য করিতে হইবে, আমরা কেবলমাত্র তাহাই প্রদর্শন করিলাম। সর্ব্বসাধারণের মন যাহাতে এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

চির-প্রস্থান।

১

গভীর—গভীরতর, অনন্ত আঁধার রাশি
আসে বিশ্ব করিবারে গ্রাস,
আশার প্রদীপ মালা, নিভাইছে ক্রমে ক্রমে
হৃদয়ের প্রবল নিশ্বাস।
ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের শক্তি, উদ্বেগের চিতানলে
পুড়িয়া হ'তেছে ছারখার,
অন্তরের অন্তস্তলে, অক্ষুণ্ণ আঁধার রাশি
করিতেছে রাজত্ব বিস্তার।
হৃদয়ের কাল মেঘ, বিসর্জ্জিয়া বারি রাশি
নাহি পায় হইতে প্রকাশ,
প্রতপ্ত নিশ্বাস-বায়ু, বাষ্পাকারে রাখিয়াছে
নেত্রপথে প্রবল উচ্ছ্বাস।
অবিশ্রান্ত ঝঞ্ঝাঘাতে, সুবিকট বজ্র-পাতে,
স-শব্দে ভাঙ্গিছে [illegible]

দেখাইয়া ভগ্নস্তূপ, বিদ্যুৎ বিকটহাসি,
চমকিছে হৃদয় কন্দর।
গভীর—গভীরতর, আঁধার—আঁধার ঘোর
দশদিক্ ফেলিল ঘেরিয়া,
কালের কঠোর দণ্ড, সঞ্চারিয়া অগ্নিরাশি
শিরঃ ফুট' যেতেছে ছুটিয়া।

২

কাতর পরাণ কাঁদে— সন্ত্রাসে কেবল দেখি
অন্ধকার দশদিকে ঘোর,
উদ্গারিয়া ফেণপুঞ্জ, অনন্ত সাগর গর্জ্জে
মহাশব্দে চারি দিকে মোর।
ভয়ঙ্কর উর্ম্মি-মালা, আছাড়ি' আছাড়ি প'ড়ে
অগ্রসর ক্রমে মোর কাছে,
এ কি রে ভীষণ দৃশ্য, প্রাগাঢ় আঁধাররাশি,
আঁধারে বেড়িয়া পুনঃ নাচে।
গত শত পাপ কথা, আনে স্মৃতি ভগ্নপ্রাণে—
সহস্র সে বৃশ্চিক দংশন,
কোনদিকে আশাপ্রদ, প্রবোধ না পাই কিছু
নিরখি যা কিছু, সব ভীষণ—ভীষণ!

৩

নানাবিধ উপহারে, যে জগৎ পূজিয়াছে
পূরা'য়েছে কত অভিলাষ
কত দিন,—আজি সেই, সে জগৎ আর নেই
আনে আজি অনন্ত সে ত্রাস।
শূন্যগর্ভ ভয়ঙ্কর, তারি ভীমমূর্ত্তি হেরি,
দ্বিগুণ কাঁদে রে আজি প্রাণ,
সুখময় মূর্ত্তি এক, ওই এনে মোর কাছে
ক'রেছিল আমারে অজ্ঞান!

৪

অনন্ত আশার বারি, ওই ঢেলে দিয়েছিল
আমার এ সুকোমল প্রাণে,
প্রমোদ করিয়ে ধরা, মধুর সুবাসে ভরা
কত শত ফুটেছিল এজীবন আশার কাননে।
মনে আশা নাহি যার, জীবনো নাহিক তার
জীবন ত সমষ্টি আশার,
জীবনের এ অস্তিত্ব, থাকিত না সে বিনা ত
তুই ই ত নষ্টের মূলাধার।
কেন আশা এনে দিস্, কেন পুনঃ কেড়ে নিস
দুরাচার, কি বিধান তোর,
কে তোরে বলিলদিতে, কে বলিল কেড়ে নিতে
প্রাণে—প্রাণাধিক আশা মোর!

৫

জগৎ বিশ্বাসঘাতী, জগৎ সে ছদ্মবেশী
জগৎ সে ঘোর প্রবঞ্চক,
সেইত ভুলা'য়ে মোরে, জানিতে না দিলকিছু
আনি' দিল অনন্ত নরক।
নিষ্ঠুর জগৎ ওরে, পূরেছে ত মন সাধ—
চরণপেষণে তোর, ঘুচা এ যাতনা ঘোর—
ত্বরা প্রাণ কেড়ে নেরে, আমারে জীবনদেরে
শমন কণ্টক হ'ল—নিশ্বাস ফুরা'য়ে এল—
উঃ কি যন্ত্রণাভার, সহিতে পারি না আর—
বিড়ম্বিত সিন্ধুপারে, আমারে ফেলিয়াদেরে
হ'কবে এ ঘোরজ্বালা শেষ,
ক্রূরতার পরিচয় বিধিমতে দিয়েছিস্—
দেখা আজ্ করণার লেশ।

৬

জীবন মরমকালে, একটী প্রাণের জ্বালা
রবি ঘোর—কতই ভীষণ,
কতই যন্ত্রণাকর, কত বিড়ম্বনা পর,
যদি তুই জানিতিস্, তবে কি এ জ্বালা দিস
তবে কি এমন ক'রে, বুঝা'তে হইত তোরে
যন্ত্রণায় বক্ষঃ ফাটে, জীবন এখনো কাটে,
এখনো না হইত মরণ;
যদি রে বুঝিত 'কেহ', নিশ্চয় মরিত সেহ—
যদি 'কেহ' বুঝিয়াছে, নিশ্চয় সে মরিয়াছে
চ'লে গেছে—দেখা আমি করিব গমন!

৭

জগৎ রে, তোরে ডাকি বৃথা আশা ভ্রম মোর
পাষাণে করুণা আছে, হৃদয়ে নাহিক তোর।
তাই যদি তোর র'বে, সরল জীবনে তবে
কেন তোর মায়াবিষ, প্রভাতে ঢালিয়ে দিস
কি সুখ যতনে রচি', মায়ার আগার ঘোর,
জগৎ রে,তোরে ডাকি বৃথা আশা ভ্রম মোর

৮

যাই হ'ক, কোথা যা'ব কিছুই জানিনা তার
সম্মুখে অপার সিন্ধু, গাঢ় তমঃ পঙ্কে আর।
স্থল নাই—কূল নাই,না পারি চিনিতে পথ,
তমোময় গর্ভ শুধু দেখাইছে ভবিষ্যৎ,
বিষময় মায়া জালে, আবদ্ধ স্বকর্ম্ম ফলে
না ল'য়ে সে সুধা নাম,খোয়াইছি পরিণাম
কাটা'য়েছি অগুদিন অজ্ঞানে মজিয়া
দীনবন্ধো, এস নাথ, আমারে আলোক দাও
দাও নাথ পথ দেখাইয়া।

৯

আর না আর না এরে,ভাঙ্গিল রে ঘুমঘোর,
ওকি! ও অনন্ত জ্যোতি,ভাতিল নয়নে মোর!
এতক্ষণ পরে বুঝি, পূরিল রে মনোরথ,
কে যেন দয়ার সিন্ধু আসিছে দেখাতে পথ,
এসেছ কি, দীনবন্ধো, পতিতপাবন তুমি,
দয়াময়, এস কাছে—হেথা তব পাপী আমি

১০

জগৎ রে, থাক্ প'ড়ে, নিয়ে মম দেহ ভার,
বাণ্ডারী এসেছে মোর,কি ভয় এ ভবঘোর।
বায়ুময় নব অঙ্গ, মিশিয়া বায়ুর সঙ্গ—
চরণের আবর্ষণে, আনন্দ বিভোর প্রাণে
অবহেলে মহাসিন্ধু, এখনি হইব পার—
জগৎ রে থাক্ প'ড়ে, র'বে ছার দেহ ভার।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

৫

বিজনবাসিনী—কলিকাতা ২ বাজার হইতে শ্রীমতী শতদলবাসিনী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। টালা, চট্টোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানির নীলকণ্ঠ যন্ত্রে শ্রীউদিতেন্দুশেখর মুস্তফীদ্বারা মুদ্রিত। মূল্য—১।০ এক টাকা চারি আনামাত্র।

এখানি নবন্যাস। বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে আজকাল নাটক বা নবন্যাসের অপ্রতুল নাই। নবীন, প্রবীন, খ্যাতনামা, অখ্যাত নামা 'গ্র্যাডুয়েট', 'অণ্ডার গ্র্যাডুয়েট'—সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নাটক বা নবন্যাস লিখিয়া বঙ্গভাষার 'সপিণ্ডকরণ' সাধিতে ত্রুটি করিতেছেন না। পারেন বা না পারেন, এত লোক যে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনকল্পে (অন্ততঃ মনে মনে) বাসনা করেন, ইহা সমধিক আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবার [illegible] মহিলারাও তাঁহাদিগের [illegible]

সহিত [illegible] কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। আমাদিগের উপস্থিত সমালোচ্য গ্রন্থখানি তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্কিমবাবু নবন্যাস লিখিয়া যে সাহিত্যের মুখোজ্জল করিয়াছেন, স্বর্ণকুমারী 'দীপনির্ব্বাণে' যাহার পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, শতদলবাসিনী সে ক্ষেত্রে যে 'বিজনবাসিনীর' দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিবেন, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস নাই, তবে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ তাঁহার 'বিজ্ঞাপন' পাঠে জানা যায়, তাঁহার 'জীবনোপায়ের গত্যন্তর নাই',—এই পুস্তক-বিক্রয়ের লাভালাভের উপর তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের সুখ দুঃখ নির্ভর করে; এজন্য তিনি সমধিক শ্রদ্ধার পাত্রী। বঙ্গ পুর মহিলারা বৃথা কার্য্যে সময়ক্ষেপ না করিয়া অবসর মত তাঁহাদিগের গুণ সৎকার্য্যে পর্য্যবসিত করেন ও তদ্দ্বারা আপন সংসারের আর্থিক উন্নতিবিধানে যত্নবতী হয়েন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের গ্রন্থকর্ত্রীর 'জীবনোপায়ের গত্যন্তর নাই' কেবল এই কারণে তাঁহার গ্রন্থখানির উত্তম 'কাট্‌তি' হইবে কি না বলিতে পারি না, তবে 'সহৃদয় মহোদয়গণ', অধিকন্তু মহোদয়াগণও, এই উপলক্ষে আর্থিক আনুকূল্য করিয়া তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধন করেন, ইহা আমাদিগের প্রার্থনা।

এই নবন্যাসে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা নানাবিধ শাখা প্রশাখাদি সহ বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জমীদার। বিজয়কৃষ্ণ ও অতুলকৃষ্ণ নামক তাঁহার দুই পুত্র। পিতার পরলোকান্তে জ্যেষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। বিজয়কৃষ্ণ বিবাহিত, কিন্তু তাঁহার পত্নী মৃতা,—অতুল অদ্যাপি পরিগৃহীত। কলিকাতায় (বিজয়ের শ্যালক হীরালালবাবুর শ্যালিকা!) শৈলবালার সহিত অতুলের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; অতুল ইদানীন্তন কালের লোক, স্বচক্ষে সুন্দরী কন্যা দেখিয়া বিবাহ করিবেন,—এই ইচ্ছায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও জননীর অনুমতিক্রমে স্বয়ং একমাত্র ভৃত্য সমভিব্যবহারে জলপথে কলিকাতায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়াতে বনগ্রাম নামক কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে এক সদ্গোপের বাটীতে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত আশ্রয় লয়েন। ঐ সদ্গোপের বাটীর পার্শ্বে একটী অসহায়া অবিবাহিতা পরমা সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণকন্যা বাস করিতেন, তাঁহার নাম বিজনবাসিনী। সদ্গোপ তাঁহারই বাটীতে অতুলের আহারাদির বন্দোবস্ত করা উপলক্ষে অতুল ও বিজন পরস্পর পরস্পরের [illegible] আকৃষ্ট হয়েন। ক্রমে এ সম্বাদ বিজয়ের কর্ণে পৌঁছে। শৈলবালা অতুলের মনোনীতা না হওয়াতে তিনি সে বিবাহে সম্যক্ অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের ও জননীর অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছাতেও অগত্যা তাহারই পাণিপীড়ন করিতে বাধ্য হয়েন। পরন্তু তাঁহার মন চিরদিন অবিচলিতভাবে বিজনবাসিনীর প্রেমাশায় আকৃষ্ট ছিল।

রাধাকৃষ্ণবাবুর জমীদারীর অন্তর্গত কোন কাছারীবাটীতে একটী সদ্বংশীয়া বাল্যবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পাচিকা ছিল। রাধাকৃষ্ণবাবু সেই কাছারিতে গতায়াতকালে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কুলত্যাগিনী করেন, কালক্রমে তাহার গর্ভে পারিজাতমালা নাম্নী এক পরমা

সুন্দরী কন্যা জন্মে। রাধাকৃষ্ণবাবু পারিজাতকে তনয়ানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন ও সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলেন, দৈব দোষে সেও অত্যল্পকালের মধ্যে বিধবা হয় ও রাধাকৃষ্ণের পরিবারভুক্তা হইয়া থাকে। বিজয়কৃষ্ণের চরিত্র নিতান্ত কলুষিত—লম্পট, পাপাশক্ত, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। রাধাকৃষ্ণ ও পারিজাতের জননীর পরলোকান্তে এবং বিজয়ের পত্নী বিয়োগ হওয়াতে বিজয় তাঁহার পিতার পথ অবলম্বন করিয়া সেই বরবর্ণিনীর ধর্ম্মনাশ করেন। পারিজাত নিতান্ত সৎস্বভাবা ও বুদ্ধিমতী ছিল, কিন্তু যৌবনের তাড়নে ও বিজয়ের প্রলোভনে সহজেই মুগ্ধা হয়, সুতরাং তাহাকে কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিতে হয়। বিজয় কামুক তাঁহার প্রেম রূপজ,ক্ষণস্থায়ী, অভাগিনী পারিজাতের যৌবনের গত বিগতোন্মুখ হইলেই তিনি তাহার বীতস্পৃহ হয়েন। ইতিমধ্যে লোকমুখে বিজনবাসিনীর রূপের কথা শুনিয়া বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলে তাঁহাকে কোন আত্মীয়ের গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। পারিজাতের প্রেম গাঢ়, অক্ষুণ্ণ, অবিচলিত, বিজয়ের বিসদৃশভাব সন্দর্শনে সে মনের ক্ষোভে পিতৃ সংসার ত্যাগ করে, ও দৈবক্রমে বিজনবাসিনীর সম্বাদ পাইয়া বুদ্ধি-কৌশলে তাঁহাকে অবরোধ মুক্ত করে। তদবধি তাহারা দুইজনে সহোদরা নির্ব্বিশেষে পরস্পর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কালক্ষেপ করিত। পরিশেষে নানারূপ ঘটনাবৈচিত্রে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর প্রয়াগের নিকটস্থ কোন পর্ব্বতের গুহায় অজিন সিংহ নামক জনৈক সংসার বিরাগী রাজার শান্তি নিকেতনে সকলের সমাগম এখানে আসিয়া অতুলের সহিত বিবাহ হয় (ইতিপূর্ব্বে শৈলবালার রোগে মৃত্যু হইয়াছিল।) অজিন সিংহ নিঃসন্তান হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে অতুল তাঁহার সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন, জননীর ইচ্ছা ও আদেশ মত বিজয়কৃষ্ণ সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন, বনগ্রামের সদ্গোপ অতুলের রাজপারিষদ্ হইয়া তাহার নিকট বাস করেন, অতুল বিজয়ের জননী ও অজিনসিংহ নিশ্চিন্ত হইয়া বাণপ্রস্থাবলম্বন করেন আর অভাগিনী পারিজাত বিজয়ের প্রেমে নিরাশ হইয়া নিরবচ্ছিন্নবিলাস ভগবৎচিন্তায় জীবনাবশেষ অতিবাহিত করিয়া পাপের অবসান করে।

গ্রন্থ প্রণেত্রী বোধ হয়, এ উদ্যমে এই প্রথম উদ্যোগী। তাঁহার এখনও 'হাত পাকে নাই'—তিনি রূপ বর্ণনে যতদূর প্রয়াস পাইয়াছেন, চরিত্র বিন্যাসে তত কৃতকার্য্য হয়েন নাই, সকলগুলিই অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। পুরুষের দোষে স্ত্রী স্বভাব কলুষিত হয় ইহাই বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, আখ্যায়িকার বর্ণিত চরিত্রে তাহা ততদূর প্রতীয়মান না হউক, লেখিকা স্বয়ং সে কথা বারম্বার নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি কতদূর সারগর্ভ আমরা বলিতে পারি না; স্ত্রীজাতি পুরুষের দোষ দেখেন, পুরুষ আবার স্ত্রীর দোষ দেখেন, ইহা একরূপ পরস্পরের স্বভাবসিদ্ধ দোষ, কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়নের কার্য্যভার স্কন্ধে লইয়া নিরপেক্ষভাবে সকল কথা বলাই সঙ্গত। কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকল চরিত্রেই দোষ গুণ থাকিবে,

সাবের সকল বস্তুই ভাল মন্দে জড়িত, বে আপন চেষ্টাদ্বারা কু প্রবৃত্তি সকলকে ীভূত করিয়া সদাচারে জীবন অতি-বাহিত করাই পরম পুরুষার্থ,—ইহা পুরু-ষের পক্ষেও যেরূপ উচিত, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ কর্ত্তব্য। বিজয়কৃষ্ণ অস চ্চরিত্র লোক ছিলেন সত্য, কিন্তু নানারূপ বিঘ্ন সত্ত্বেও পারিজাত যদ্যপি দুরন্ত রিপু সকলকে দমন করিয়া বিজয়ের অসার প্রণয়ে মুগ্ধ না হইতেন, তবেই আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতাম, তাঁহাকে নারী রূপিণী দেবী ভাবিয়া পূজা করিতে পারিতাম। তবে তিনি বিজয়ের প্রতি প্রেম চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবিষ্যতে মনের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। বিজয়কে লেখিকা অন্য নানাবিধ দোষ সত্ত্বেও 'মাতৃ

[illegible] ।সা
াগ করিতে পারিলেন না কেন? মাতৃ-জ্ঞায় কোন স্থানান্তরে যাওয়া বা বিষ-য় তত্ত্বাবধারণ করা এ স্থলে মাতৃ ভক্তির .্যক্ চিহ্ন-জ্ঞাপক নহে।

পুস্তকের রচনা যাহা হউক অনেক স্থলে রসিকতা করিতে গিয়া গ্রন্থকর্ত্রী কেবলমাত্র কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের রচনায় পবিত্রতাই আমরা আশা করিয়া থাকি, তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে অত্যন্ত দুঃখিত হই। ভরসা করি গ্রন্থকর্ত্রী ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটু মনযোগী হইবেন।

বিধবা বঙ্গললনা।—নিউ ইডন্ প্রেসে শ্রীনারায়ণদাস ধর দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য ৸০ বার আনামাত্র।

এখানিও উক্ত গ্রন্থ প্রণেত্রী বিরচিত একখানি নবন্যাস। "বিজনবাসিনী" সমা-লোচন যন্ত্রস্থ হওয়ার পর এ খানি আমা-দিগের হস্তগত হয়। নবন্যাসখানি সম্পূর্ণ নহে, প্রথম খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা অসঙ্গতবোধে আমরা উপস্থিত বিরত থাকি-লাম, অপর খণ্ড হস্তগত হইলে বারান্তরে সমালোচন করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে ইহার সম্বন্ধে একটী কথা বক্তব্য আছে। লেখিকা "বিজনবাসিনীর" উপসংহারে বলি-য়াছিলেন, "যথোচিত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া আমি এ পুস্তকখানি পরি-সমাপ্ত করিলাম, হয় ত চতুর্দ্দিক হইতে ভূরি নিন্দা আসিয়া আমার মস্তকে পতিত হইবে, যদি সে সকল পীড়ন সহ্য করিয়া জীবিত থাকি, তাহা হইলে পুনরায় আপ-নাদিগের সহিত আলাপ করিব, নতুবা এই স্থানেই বিদায়।" উপস্থিত আবার তাঁহার দর্শনলা[illegible]াদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে "বিজ[illegible] তাঁহাকে "ভূরিভূরি নিন্দা" মস্তকে বহিতে হয় নাই। আমরা "বিজনবাসিনী"সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া নিন্দা করিলাম কি প্রশংসা করিলাম বলিতে পারি না, তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া যাহা মনে উদয় হইয়াছে তাহাই বলিয়াছি। এ বারেও তিনি "মনের কথা" সাধারণ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন,—'তাঁহার আর গত্যন্তর নাই," পুস্তক প্রণয়ন ও বিক্রয় করিয়া ভিক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, কারণ উহাই তাঁহার

"ভিক্ষার ঝুলি" আর "একমাত্র সম্বল।" আমরাও পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও প্রার্থনা করি যেন পাঠক-পাঠিকাগণ কৃপাচক্ষে (তাঁহার ন্যায় অনাথিনী) বিধবা বঙ্গললনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

উপসংহারে আর একটী কথা বক্তব্য। গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণকার্য্য পরিপাটী হয় নাই এবং মূল্য ও অধিক হইয়াছে। স্বকীয় আর্থিক আনুকূল্য চেষ্টায় তিনি এই রূপ কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন তিনি "বিজনবাসিনীর" বিজ্ঞাপনে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পুস্তক বিক্রয়ের "ব্যবসাবলম্বিনী", তখন ব্যবসা সুলভ বাহ্যিক পারিপাট্য প্রকাশ করিয়া ক্রেতার মনোমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার উচিত ছিল। দান আজকাল অতি অল্প লোকেই করে, পুস্তক ক্রেতার সংখ্যাও বাঙ্গালায় অধিক নাই, তাহাতে আবার দ্রব্যের মূল্য অধিক হইলে ক্রেতা ত সে দিক দিয়াই চলিবে না। কিন্তু 'কাট্‌তির মুখে লাভ'—ব্যবসায়ীর একথাটী স্মরণ রাখা উচিত,—যদি পুস্তক বিক্রয়ই না হইল, তবে কে তাঁহার গুণের পরিচয় বুঝিবে আর কিসেই বা তাঁহার উদরপূর্ত্তির উপায় হইবে? ভরসা করি, ভবিষ্যতে গ্রন্থ প্রণেত্রী এসম্বন্ধে একটু 'নজর' রাখিবেন।

———:*:———

উদ্ভ্রান্তপ্রেম।

২

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সেই মুখ খানি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রী ও পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীন মিলন না হইলে কেহই পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয় না। যে পুরুষ বা স্ত্রী, অন্য স্ত্রী বা পুরুষের সহিত মিলিত না হইল তাহার দ্বারা সংসারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, সে চিরকালই অপূর্ণ রহিয়া গেল, তাহাকে আমরা সংসারের উদ্দেশ্যর মধ্যে পাইলাম না। আবার যাহার মিলন বিচ্ছিন্ন হইল সেও এক নূতন সত্তায় পরিণত হইল। যে মিলনে সংসারের সকল দ্রব্যের একত্র সঙ্গতি শিখিতে পারা যায়, সে মিলন হইতে যদি এই মহতী শিক্ষালাভ না হয়, তাহা হইলে সে মিলনের মিলন-ভঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে—সে বিচ্ছেদ হৃদয় হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে হৃদয়কে একেবারে পৃথক করিয়া দেয়; হৃদয়ে তখন কিছুই থাকে না, থাকে কেবল বিশ্বব্যাপী অভাব, জীবনটা

তখন জীবন্ত অভাব হইয়া দাঁড়ায়। যে মহতী শিক্ষার জন্য স্ত্রী পুরুষের মিলন, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রেমিকের সে শিক্ষা হয় নাই, হইলে, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম সঙ্গীত গীত হইত না। তবে শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেবল মাত্র আরম্ভেই ব্যাঘাৎ ঘটিল, স্ত্রীপুরুষ সমন্বিত পূর্ণাঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল অর্থাৎ স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রী পরলোকগতা হইলেন। এরূপ অর্দ্ধাঙ্গ বিচ্ছিন্নতায় পূর্ণাঙ্গের অপরার্দ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, সমস্ত সমাজ শরীর বিকল হইয়া যায়, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও সফল হইতে পায় না—এ কথা লেখক অন্তরের সহিত অনুভব করিয়াছেন এবং তাহার পাঠক দিগকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হন নাই, এরূপ আমরা বলিতে পারি না।

তৎপরে পত্নী বিয়োগে পতির শোক সম্বন্ধেও লেখক সামান্য হৃদয় মহত্বের পরিচয় দেন নাই। পতিবিয়োগে অনেক রমণীকে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিতে শুনা গিয়াছে, এমন কি এক সময়ে বহুকাল ধরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করা সামাজিক একটি প্রথা বলিয়াও এ দেশে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু কয় জন স্বামীকে পত্নীর সহগমন করিতে শুনা গিয়াছে? একজনও নহে। ইহা কি আক্ষেপের বিষয়—সমগ্র পুরুষ জাতির অতিশয় কলঙ্ক এবং লজ্জার কথা নহে? যে প্রেমের বিনিময়ের জন্য পরস্পর স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ তাহা উভয় পক্ষকেই সমভাবে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে উত্তেজিত না করিলে উভয়ের সম্বন্ধ-বিড়ম্বনা মাত্র—তাহাতে পবিত্রতা দুর্ল্লভ, তাহাতে শান্তি দুর্লভ, তাহাতে সুখ ও এক প্রকার অসম্ভব। স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি যেমন, স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি তেমনই হইবে আমরা আশা করি, কিন্তু তথাপি সংমরণ করিতে স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষের চিতারোহণ কখন দেখিতে পাই না। ইহা কি নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার নহে? পুরুষের দেবতা ঈশ্বর, কিন্তু স্ত্রী পুরুষই একমাত্র দেবতা এবং পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীর গত্যন্তর নাই—এ কথা সত্য এবং ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু পুরুষের স্ত্রী প্রেম এবং স্ত্রীর পুরুষ ভক্তি—এতদুভয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্গতি ব্যতীত কি এ সংসারে মুক্তি সম্ভব? কখনই নহে। সংসারে আমরা ভক্তিকেই প্রেমের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে দেখি, প্রেমকে ভক্তির পথে যাইতে কৈ বড় একটা দেখি না। কিন্তু ইচ্ছা করে যে প্রেম ও ভক্তিতে যোগে [illegible] জড়িত হইয়া পরস্পর পরস্পরের [illegible] করে—স্ত্রী যেমন পুরুষের পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় গমন করে, পুরুষও তেমনই ছায়ার সহিত আলোকের ন্যায় গমন করে। আমাদিগের বাসনা, সমালোচ্য কাব্যে কতকটা সফল হইয়াছে—উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের কবি স্বীয় প্রণয়িনীর জন্য প্রাণ দান করিতে চাহিয়াছেন। সেই প্রেমভিক্ষাপূর্ণ "মুখ খানি" আর একবার দেখিবার জন্য বলিয়াছেন—"সেই মুখ আর একবার দেখাইবার জন্য, কি চাও? জীবন লও, * * *।" এই পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াই যে নিরস্ত হইয়াছেন, এমন নহে—'জীবনের সর্ব্বস্ব' পর্য্যন্ত দিয়াও আর একবার দেখিতে সম্মত হইয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের প্রকৃত সম্বন্ধ একবার আবদ্ধ হইয়া গেলে একের জীবন অন্যময় হইয়া যায়, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই

নিয়ম। সমালোচ্য কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। স্বামী বিয়োগে স্ত্রীর জীবন যেমন চন্দ্রহীন রজনীর অন্ধকারে পরিণত হয়, প্রণয়িনী ভার্য্যার বিয়োগে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রেমিকের হৃদয় ও তদ্রূপ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে। এ প্রাণ খুলিয়া এক এক করিয়া তাহার অংশ সকলকে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমরা দেখিতে পাই—তাহাতে যেন কি নাই, তাহা যেন অসম্পূর্ণভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, আর পাগল প্রাণ যেন তাহারই অভাব অনুভব করিয়া অভাবনীয় সামগ্রীর জন্য ব্যাকুল হইয়া জীবনভার বহন করিতেছে। সে অভাবনীয় সামগ্রী কি? প্রণয়িনীর হৃদয়—যে মুখে সেই হৃদয় উদ্ভাসিত, "সেই খানি।"

মনুষ্যের যত প্রকার সুখ দুঃখ, সমস্তই অভাব ও তাহার বিমোচনোপায়ের তারতম্য অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয়। যাহা [illegible] পারে, কিন্তু আপাততঃ মিলিতেছে না, তাহার অভাব মনকে যত উদ্বেলিত করে, যাহা একেবারে পাইবার উপায় নাই, তাহার অভাব, বাসনার উপর অধিকতর উৎপীড়ন করিয়া থাকে। আবার যাহা ছিল কিন্তু এক্ষণে গিয়াছে, দুই চারি দিনের জন্য যায় নাই, সমস্ত জীবনের জন্য গিয়াছে, হয় ত জন্মজন্মান্তরের জন্যও গিয়াছে, তাহার জীবন্ত অভাব জীবনের সহচর। জীবনে অভাবে, অভাবে জীবনে একত্র মিশ্রিত হইয়া যাহাতে জীবন্ত অভাবের সত্তা উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় অবসাদ-মগ্ন জীবন কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। সে অভাব যে কেমন, তাহা বর্ণনা করা অত্যন্ত কুশলীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। আপন জীবনকে যে না তেমনি অভাবময় অবসাদ হ্রদে নিমগ্ন করিয়াছে, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? এই কারণে কবি প্রথম পংক্তিতেই বলিয়াছেন—"কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখ খানি?"

কবির জীবন যে রূপ অভাবময়, জীবনে অভাবে মিলিয়া যে নূতন এক প্রকার নিস্তেজ জীবন গঠিত হইয়াছে, অভাবনিবন্ধন যে প্রকার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ততা জন্মিয়াছে, তাহার চিত্র প্রথম পংক্তিতে আরম্ভ হইয়া শেষ পংক্তিতেও শেষ হয় নাই। নষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা এতই তীব্র, সুদূর-প্রস্থিত সেই মুখ খানি এমনই জীবন-সঞ্চারিণী যে, জীবন দান করিলেও তাহার অভাব বিমোচিত হইবার নহে। স্ত্রী পুরুষের এমনই সম্বন্ধ, এক হৃদয় হৃদয়ান্তরের জন্য এতই পাগল, সুখশান্তিসৌন্দর্য্যের জন্য মনুষ্য এতই লালায়িত যে, যাহা গিয়াছে তাহা যে একেবারে গিয়াছে, জন্মশোধ গিয়াছে, তাহা জানিয়াও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনবরত তাহাই চাহে। এই কারণে কবিও সেই মুখ খানি একবার দেখিতে চাহেন। মনুষ্য এতই সুখের কাঙ্গাল যে, যাহা কালের অতলগর্ভে নিহিত হইয়াছে তাহার জন্যও পাগল হইয়া উঠে! হিতাহিত বিবেচনাশূন্য, সম্ভাবাসম্ভব জ্ঞানশূন্য শিশু যেমন গগণের চন্দ্র ধরিতে চাহে এবং না পাইয়া ব্যাকুল হয়, কবিও তেমনই ঘোর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্রের ছায়ার জন্য নিতান্ত অস্থির! যাহা জীবনের জীবন এবং যাহা ব্যতিরেকে মনুষ্য জড়পিণ্ডবৎ, তাহার প্রলোভনের এতই মোহিনী শক্তি যে, সে শক্তি প্রকৃতি মানে না, সম্ভবাসম্ভব বুঝিতে চাহে না। মানব

মনের এমনই ধর্ম্ম যে, তাহার বাসনার একাগ্র স্রোত যে দিকে ধাবিত, তাহা নিতান্ত দুর্গম ও বন্ধুর হইলেও সে তাহার গতি অনুসরণে পরাঙ্মুখ হইবার নহে। সেই বাসনা, জন্মশোধ পরিতৃপ্তির জন্য নহে, কেবলমাত্র নিমেষের পরিতৃপ্তির জন্য যাহা লাগে, কবি তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত, তাঁহার যাহা আছে তাহাই প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প। ইহা হইতেই কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই বাসনা আজীবন পরিতৃপ্তি ও সম্পূর্ণ চরিতার্থতার জন্য তাঁহার পক্ষে কি না সম্ভব। স্ত্রীর জন্য পুরুষের আত্মোৎসর্গ সম্ভব কি না।

প্রকৃত মনুষ্য প্রকৃতি এই রূপ কি না? প্রিয় পদার্থের প্রতি একাগ্রতা এতই সতেজে স্থাপিত হয় কি না? অর্দ্ধাঙ্গের জন্য অপর অর্দ্ধাঙ্গ ত্যাজ্য কি না? ইতিহাস ও প্রকৃতি সাক্ষ্য দিতেছে বটে যে, অন্যের জন্য, বিশেষতঃ প্রণয়পাত্রের জন্য আপন জীবন বিসর্জ্জন অসম্ভব নহে এবং এ প্রকার ঘটনাও বিরল নহে, কিন্তু যাহারা নষ্ট দ্রব্যের উদ্দেশে—তাহা পাইবার জন্য নহে, আপন জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিতে পারে তাহারা কি মূর্ত্তিমান দৌর্ব্বল্য নহে? রোমীও হলাহল পানে এবং স্যাফো লীউকেটের শিখর হইতে পতনে, প্রণয়ের একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আয়েসা কি দুর্গ পরিখার জলে হস্তস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিয়া সামান্য একাগ্রতা দেখাইয়াছেন? চন্দ্রশেখরের নির্ব্বাক্ সন্ন্যাস কি হ্যাম্‌লেটের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ততার অপেক্ষা সামান্য প্রণয়-ব্যঞ্জক? কেবল ভোগ সুখের জন্য, আপন স্বার্থতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য, স্বার্থপর প্রণয়ের জন্য যে জীবন-উৎসর্গ, তাহা প্রশস্ত নহে, আমরা তাহার অনুমোদন করি না—অনুমোদন করিবার যোগ্য কেবল তোমার সুখের জন্য আমার জীবন-উৎসর্গ, কেবল নিঃস্বার্থ প্রণয়ের জন্য আত্ম সমর্পণ। কিন্তু কবি আপন ভোগ সুখের জন্য, বৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য, আপন জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনের জন্য যাহা লাগে তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। এই জন্য বলি যে, কেন্দ্র হইতে তাঁহার জীবনের ব্যাস নিতান্তই সঙ্কীর্ণ—তাহাতে গাঢ় অনুরাগ থাকিলেও নিতান্ত সংকীর্ণ বলিতে হইবে!

যে জীবনে সুখ নাই, উৎসাহ নাই, রস নাই, স্থিতিস্থাপকতা নাই সে জীবন না [illegible] যাহা দেওয়া আরও ক্লেশকর, কবি [illegible] জীবনের সর্ব্বস্বও দিতে স্বীকৃত হইতেন, কেন না যাহা উত্তম, তাহার জন্য উত্তম সামগ্রীরই বিনিময় করিতে হয়। সংসারের জড় প্রকৃতির অত্যাচার দেখিয়া যিনি মঙ্গলময় ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার জীবন গেলেই সকল গোলযোগ নিবারিত হয়, সুতরাং জীবন-দানটা যথেষ্ট নহে বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কাতর হইলেন না। দিতে পারিতেন না, কেবল এক ধন—যখন তাহা ছিল—ত্রিভুবনের সমস্ত সুখের জন্য নহে, সচ্চিদানন্দে লীন হইবার জন্য নহে, অসাধ্য সাধনের ক্ষমতার জন্যও নহে। সুতরাং জীবনের সর্ব্বস্ব

অ

জ

ন

বাদা- ইহার যে মূল্য কত অধিক, তাহা তাবৎমধ্যে বুঝা গেল। ফলতঃ বিজ্ঞানের অপরিসীম আনন্দ, ধর্ম্মের বিমল শান্তি, সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রণয়ের পবিত্রতা, অখিল সংসারের আনন্দ ছবি, কিছুই তাহার সমকক্ষ হইবার যোগ্য নহে, কিছুই তাহার স্থান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে। প্রণয়ের বাস্তবিক এমনই মূর্ত্তি ঘটে, এবং এরূপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে না পারিলে, সে প্রণয় অগাধ ও গাঢ় নহে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বার্থপর প্রণয় কেবল রূপের ভেকমাত্র।

বড় আশায় নিরাশ হইলে, অপরিসীম সুখের সামগ্রী নষ্ট হইলে, আসিবার আশায় ছাই দিয়া জীবনের যে জীবনী সে পলাইলে, প্রাকৃতির নিয়মে কেহই আর স্থির থাকিতে পারে না। মত্ত হস্তী যেমন ভাঙ্গিলে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ী করে বেড়ায়, বেগবতী নদী স্রোত প্রতিহত যেমন প্রান্তরকে প্লাবিত করিয়া দিগ্বিদিকে প্রধাবিত হয়, ষোল আনা বাসনা প্রতিহত হইলে মনুষ্য প্রকৃতিও পবিত্র জীবনের পথ হারাইয়া সেই রূপ অবিশ্বাসের অপবিত্র পথে গিয়া পড়ে। ইহা এক দিকের চিত্র। যেমন ছায়ার দিক্ অন্ধকারময়, তেমনই প্রকৃত বর্ণের দিক্ আলোকময়। সুতরাং এত যে কঠিন অবিশ্বাস, ঐশ্বরিক নিষ্ঠুরতা জ্ঞান, জড় জগতে হৃদয় হীনতার আরোপ, তাহার ভিতরেও, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতি বিরাজিত থাকা অসম্ভব নহে। যদিও সকল সময়ে সকল

পি

র

।

সহজ প্রকৃতিতে, অর্থাৎ বিশেষে চিন্তা করিয়া না দেখিয়া, যখন আমরা কোন অভাব দেখি না, তখন বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয় না, অবসর এবং প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায় না। কিন্তু যখন কোন একটা বিশেষ অভাব আসিয়া উপস্থিত হয় বা বর্ত্তমান সুখের বিঘ্ন ঘটে, তখন কিছুই ভাল লাগে না, এবং আমাদিগের যাহা যাহা আছে তাহাতে তাহাতে অভাবনীয় বা নষ্ট দ্রব্যের অভাব বিনোচিত হইতে পারে কি না, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া দেখিতে বসি। কবিও তাহাই করিতে বসিয়াছেন। দারুণ অভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জগৎ সংসারের প্রিয় ও পবিত্র বস্তুকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া, আজিকার দুর্দ্দিনের সহিত পূর্ব্বের সুখের দিনের তুলনা করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে যে সকল দেবভাবের অভাব দেখিতেছেন, সেই দেবভাব যখন হৃদয়ে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল, তখন, আমরা ইঙ্গিতেও বিন্দুমাত্র জানিলে, তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা না করি, বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা জানি না বলিয়াই সন্দেহ হয়, পাছে তাঁহার নিজের মনোভাবের ও প্রবৃত্তির পূর্ব্বচিত্র বর্ণন করিতে গিয়া কল্পনা-প্রসূত চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। আজ তাঁহার ঘোর দুর্দ্দিন—বৈশাখের দ্বিপ্রহর দিবাভাগে, ভাদ্র মাসের মেঘাবৃত অমানিশার অন্ধকার। সমস্ত গ্রন্থ খানিতেই ঐ অন্ধকারের আরও অন্ধকারময় ছায়া পড়িয়াছে। সুদিন যে কেমন ছিল, তাহা আমরা জানি না—দুর্দ্দিনের ছায়া হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লইতে

আমরা বাধ্য। কিন্তু আজ সেই হৃদয়ের সামগ্রী হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটন করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, কবি স্বয়ংই সে চিত্র প্রতি ফলিত করিতে 'হাবি' মানিয়াছেন। প্রচণ্ড ভূকম্পনের সময় যেমন চরণ স্থির রাখা যায় না, হৃদয় হারাইয়া, হৃদয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, ভগ্নহৃদয়ে প্রতিভাত সেই মুখ খানির চিত্রও তেমনই অঙ্কিত করা অসম্ভব। যাহার সহিত সুখের, শান্তির, সৌন্দর্য্যের, পবিত্রতার, রমণীয়তার, প্রীতির, মধুরতার কিছুমাত্র সঙ্গতি ও সাদৃশ্য আছে তদ্ভাবের জাজ্বল্যমান ছবি লিখিয়াও সেই মুখখানি চিত্রিত করিতে অপটু—শব্দ সাগরের বাছা বাছা রত্নের দ্বারাও সে ভাব প্রকাশ করিতে অশক্ত। সে ছবি অঙ্কিত করা, সে ভাব ব্যক্ত করা কাহারও কর্ম্ম নহে—সংসারের এমনই নিয়ম যে একের অভাব অন্যের দ্বারা বিনোচিত হয় না। যে সকল কবিত্বপূর্ণ অনন্ত ভাবোদ্দীপক শব্দের এক একটী শব্দ, কবির নিকট এক এক খানি সুবৃহৎ কাব্যতুল্য, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইল না। হৃদয়ে যে চিত্র জাগিতেছে, হৃদয়ের সহস্র চক্ষুর সম্মুখে যে চিত্র নিয়ত উপস্থিত আছে, তাহা চিত্রিত করা হইল না। তাই আক্ষেপ করিলেন যে, "বুকের ভিতর কি কুল্ কুল্ করে, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না কেন?"

"সেই মুখ খানি" যে সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতার সার, সংসারের সমস্ত সুন্দর ও সুখকর সামগ্রীতে তাহা রচিত, বিশ্বসংসারে তাহার উপমাস্থল নাই, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের পাঠক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। ইহা রূপের সৌন্দর্য্য নহে, বাহ্যিক চাকচিক্যের সৌন্দর্য্য নহে, যাহাতে মোহ উৎপন্ন করে, ইহা তাহাও নহে। ইহা প্রেমের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, লজ্জার সৌন্দর্য্য, হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্যের আধিপত্য, ইহা সেই সৌন্দর্য্য। রূপ কয় দিনের জন্য? রূপ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, হৃদয় অধিকার করিতে পারে না, হৃদয়ে রূপের কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকে না কবি সে রূপের মোহে পতিত হন নাই। যে সামগ্রী হৃদয় শূন্য করাতে হৃদয়ে 'অখিল সংসার' পূরিয়া, 'সমগ্র মানব জাতিকে' স্থান দিয়া শূন্য হৃদয় পূরে নাই, সে সামগ্রী কি বাহ্যিক রূপ? সেই মুখের যে আকর্ষণী শক্তির কথা, যে কুহকের কথা, যে প্রয়োজনীয়তার কথা কবি অনন্ত অম্বরে, উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া [illegible] বোধ হয় কেহই তাহা অযথা [illegible]য়া স্বীকার করিবেন না, এ স্থলে যে [illegible]দ হইবে না, তাহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু সে মুখও মাটী হইয়াছে বলিয়া ঐশিক নিয়মে বিশৃংখলা নির্দ্দেশ করাতে কবির সহিত অনেকের মতভেদ হওয়া সম্ভব। বোধ হয় ইহা অবগত হইয়াই কবি তৎপোষণার্থ বিস্তর তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, সকল তর্কের মীমাংসা করা অল্প সময় ও কথার কার্য্য নহে। যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হয় না তাহাদিগকে আমরা আবার বলি যে, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের প্রেমিকের প্রেম-শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে, অখিল সংসারকে, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হৃদয়ে স্থান দিয়া যাঁহার শূন্য হৃদয় পূরে নাই ঐশিক শাসন যে তাঁহার কাছে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইবে, তাহা আমরা আশা করিতে পারি

না। প্রেম-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতে হইত না, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের সৃষ্টিও হইত না, কিন্তু শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইহায় প্রেমও উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কখন স্বর্গে উঠিতে চাহিতেছে আবার কখন বা অতল রসাতলে নামিয়া যাইতেছে

ক্রমশঃ

বাঙ্গালায় ব্যবসায়বাণিজ্য।

একটী প্রস্তাব।

অতীব সুখের বিষয় যে আজ কাল আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোক দিগের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি এবং শিল্পের কথা উঠিয়াছে। সকলেই আজ কাল বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্য বলিতেছেন এসমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে আর আমাদের উপস্থিত কষ্টের উপায় নাই। কার্য্যতঃ এসম্বন্ধে যদিও বিশেষ রূপ এখনও কিছু হয় নাই, কিন্তু চর্চ্চা খুব হইতেছে। দেশের সকল সম্বাদ এবং সাময়িক পত্রে প্রত্যহ এই বিষয়ে নানাবিধ প্রবন্ধাদি বাহির হইতেছে; সাধারণে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেছেন এবং কিসে তল্লিখিত উপায়াদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় তাহাও বাস্তবিক আন্তরিকতার সহিত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সমস্ত অতি সুলক্ষণ, এবং প্রকৃত দেশহিতৈষী এমন কে আছেন যে ইহা দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদিত না হইবেন? কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে একটা কথা আমাদের বড় কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং দেখিতেছি যে আমাদের সকল পরামর্শ এবং চর্চ্চা তাহাতেই গিয়া পর্য্যবসিত হইতেছে। সে কথা এই যে "টাকা কোথায়?" অনেক কৃতবিদ্য চাকরির প্রত্যাশা না করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হইতেছেন, অনেক চাকুরে চাকরি ছাড়িয়া কৃষিকার্য্য করিতে উদ্যত হইতেছেন; তাঁহারা নিজেও সেরূপ উৎসাহ করিতেছেন, তাঁহাদের পরামর্শ দাতারা আবার তদপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু সকল পরামর্শ, উপদেশ, এবং উৎসাহ শেষে গিয়া ঠেকিতেছে টাকায় কথায়। "টাকা কোথায়?"—ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি শিল্প যে করিব, তাহার মূলধন কোথায়? আর সমস্ত কথার মিমাংসা হইতেছে, কিন্তু এই কথাটির আর কোন মিমাংসা হইয়া উঠিতেছেন না।

বাস্তবিকই আমাদের পক্ষে এই কথাটা বড় মসকিলের কথা। আমাদের টাকা

নাই। একেত আমরা দরিদ্রজাতি, তাহাতে আমাদের মধ্যে দুই দশ জনও যাঁহারা সম্পন্নাবস্থ আছেন, তাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যে আপনার টাকা খাটাইতে প্রস্তুত নহেন। অত্যল্প মাত্র লাভ লইয়া তাঁহারা কোম্পানির কাগজ খরিদ করিবেন, কিন্তু তদপেক্ষা দশগুণ লাভ দেখিলেও সাহস করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। এমন অবস্থায় কোথা হইতে আমাদের টাকা আসিবে এবং কি করিয়াই বা আমাদের দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইবে? ইংরাজ রাজত্বের এবং ইংরাজ বণিক দিগের শোষণে আমাদের সমধিক কষ্ট হইয়াছে বলিয়া আজ কাল ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা আমাদের মধ্যে উঠিয়াছে, কিন্তু যাঁহারা ইহার কথা বলিতেছেন অর্থাৎ যাঁহাদিগের মধ্যে এই আন্দোলন উঠিয়াছে, তাঁহারা নিঃস্ব ভাবতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁহারা উৎসাহ করিতেছেন বটে, কিন্তু অর্থের অভাবে, আবশ্যকীয় মূলধনের অভাবে, তাঁহাদের সে সমস্ত উৎসাহ উঠিতে উঠিতেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে।

তবে, এমন অবস্থায় উপায় কি? আমরা বলি, উপায় আর কিছুই নাই, যে কৃতবিদ্যেরা ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাদিগের আবশ্যকীয় মূল ধন আমাদিগকে যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। তাহা যত দিন না পারিতেছি, ততদিন আমাদের সকল উৎসাহ এবং আন্দোলন বৃথা হইবে, এবং আমরা এক সূত্রও অগ্রসর হইতে পারিব না।

অনেকে বলিতে পারেন, যে আমাদের ইহা করিবার প্রয়োজন কি? এক পক্ষে ক্রমাগতঃ আন্দোলন করিয়া এবং অপর পক্ষে অধিক অভাব কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া লোকে যখন নিতান্ত উদ্যুক্ত হইয়া উঠিবে, তখন আপনা হইতেই আপনাদিগের উপায় করিয়া লইবে—তখন আর মূল ধনের কিছুমাত্র অসদ্ভাব থাকিবে না। কিন্তু আমরা বলি ভারতবর্ষীয় সমাজের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে জন কতক অর্থশূন্য কৃতবিদ্য যুবকের ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর সমগ্র জাতীয় উন্নতির ভার ন্যস্ত করিয়া যদি আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে সে উন্নতি যে কখন হইবে এরূপ আশা আমাদের নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয়ে ত এরূপ আশা করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত বাতুলের কার্য্য। বহু যুগযুগান্তর হইতে আমাদের দেশের ভদ্র শ্রেণীস্থ লোকেরা এই ব্যবসায় বাণিজ্য কার্য্যে [illegible]নভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন; সে অনভ্যাস—বহুকালব্যাপী দৃঢ়বদ্ধ সে অনভ্যাস—যে আপনা হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে, ইহা কখন সম্ভব নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি তাহা কখন দূরীভূত হয়, তাহা হইলে আমাদের একত্রীভূত জাতীয় চেষ্টা দ্বারাই হইবে, অপর কিছুতে নহে। অর্থাৎ ইহার জন্য আমাদিগকে জাতীয় ভাবে একত্রীত হইয়া দল বাঁধিতে হইবে, এবং এক পক্ষে শিক্ষা প্রদান করিয়া অপর পক্ষে মূলধনের সুবিধা এবং কার্য্য সৌকার্য্যার্থে অন্যান্য উপায় করিয়া দিয়া আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। এভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই।

ব্যবসায় বাণিজ্যের সমধিক প্রচার দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ই যে আমাদের প্রধান অব-

লম্বন এবং ভবসাস্থল সে সম্বন্ধে বোধ করি আমাদের কিছুমাত্র মতভেদ নাই। অনেকে বলিতে পারেন যে কয়েকজন মাত্র নিঃস্ব কৃতবিদ্য যদি যোগ না দেন, তাহা হইলে কি আমাদের দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য হইবে না? আমাদের দেশে কি ব্যবসাদার লোক নাই? এত তিলি, তাতি, কামার, কুমার, শুঁড়ি, সোণারবেণে ইত্যাদি যাহারা চিরকাল হইতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে তাহারা কোথায় গেল? তাহারা কি কোন কাযে আসিবে না? আমরা বলি, কেন আসিবে না, খুব আসিবে, কিন্তু কথা এই যে শুধু তাহাদের হস্তে ছাড়িয়া দিলে আর আমাদের চলিতেছে না, কেন না, তাহারা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত, তাহাদের কৃত স্থিতিশীল এবং উন্নতিবিহিন ব্যবসায় বাণিজ্যে আর আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। তাহাদের সঙ্গে আমাদে শিক্ষিতদিগের যোগ হওয়া এক্ষণে নি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কায্য করিবে—যেমন চিরকাল করিয়া আসিয়াছে তেমনি করিবে, কিন্তু শিক্ষিতেরা (তাঁহারা যে জাতীয় কিম্বা শ্রেণীয় লোক হউন) তাহাদিগকে চালিত করিবেন। তাঁহারা বুদ্ধি খাটাইবেন, নূতন২ কথা বাহির করিবেন, নূতন২ প্রণালী নির্দ্দেশ করিবেন, নানাধির বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করিবেন, তবে না আমাদের উন্নতি হইবে? তবে না যে প্রণালীর ব্যবসায় বাণিজ্য আজ কালের দিনে আমাদের আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইবে?

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করিতে হইলেই তাহাদের কার্য্যের মূলধন আপাততঃ আমাদিগকেই যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য চির কালই যে ইহা করিতে হইবে তাহা নহে; উপস্থিতে কিছুকাল পর্য্যন্ত করিতে হইবে—অর্থাৎ যতদিন তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক স্বহস্তে এই কার্য্য করিয়া তাহার উত্তমতা উপলব্ধি করিতে না পারেন, এবং শেষে দেশের মধ্যে এক একটি উদাহরণ স্থানীয় না হইয়া উঠেন। যখন তাহাদের দৃষ্টান্তে দেশের লোক বুঝিবে যে ব্যবসায় বাণিজ্য বাস্তবিকই করা কর্ত্তব্য এবং তাহার প্রতি সকলের একটা স্থায়ী আস্থা জন্মিয়া যাইবে, তখন আর আমাদের এরূপ সাহায্যের তত প্রয়োজন হইবে না, আপনা আপনিই সকলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে থাকিবে। কিন্তু যতদিন এরূপ না হইতেছে, ততদিন আমাদের সাহায্য আবশ্যক—ততদিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবশ্যকীয় মূলধন আমাদিগকেই যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।

এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত, কি উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ভাল করিয়া এই কার্য্য করিতে পারি। আমরা নিম্নে একটি উপায় বিবৃত করিতেছি। আমাদের অভিপ্রায় যে নিম্নলিখিত প্রণালীতে আমাদের মধ্যে একটি বাণিজ্য সমিতি এবং তাহারই অধীনে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

১। দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা মিলিত হইয়া আপনাদিগের মধ্যে একটি বাণিজ্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কলিকাতায় সে সমিতি অবস্থিত হইবে।

২। উক্ত সমিতির অধীনে একটি ব্যাঙ্ক থাকিবে,—সে ব্যাঙ্ক হইতে দেশা-

ভাস্তরে ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য টাকা ধার দেওয়া হইবে।

৩। সমিতির দুইটী প্রধান কার্য্য হইবে।—প্রথম টাকা ধার দেওয়া এবং দ্বিতীয় দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের যাহাতে সমধিক প্রচার এবং উন্নতি হয় সাধারণতঃ তাহার চেষ্টা করা।

৪। ব্যাঙ্কের মূলধন অন্যূন ৬ লক্ষ টাকা হইবে।

৫। মফস্বলে কৃতবিদ্য লোকেরা পাঁচ সাত, কিম্বা দশ জন একত্রিত হইয়া এবং একটি জয়েণ্ট কোম্পানি খাড়া করিয়া ধার চাহিলে ব্যাঙ্ক হইতে মূলধনের জন্য টাকা ধার দেওয়া হইবে।

৬। এরূপ এক একটি কোম্পানিকে ৫।৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধার দেওয়া হইবে। সে টাকার এক টাকা করিয়া শত করা সুদ দিতে হইবে।

৭। রীতিমত লেখা পড়া করিয়া ধার লইতে হইবে। কোম্পানিরা আপনাদিগের মধ্যে আরও বেশী টাকা উঠাইয়া আপন কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন, কিন্তু ব্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কোথাও দেনা করিতে পারিবেন না। সেই দেনার জন্য তাঁহাদের দোকান কিম্বা কারখানা বন্ধক রাখিতে হইবে।

৮। ব্যাঙ্কের নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে এই কোম্পানিদিগের কার্য্য এবং হিসাবাদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং ব্যাঙ্কের সন্তুষ্টির জন্য সময়ের কোন হিসাব পত্র আবশ্যক হইলে তলব করিতে পারিবেন।

৯। কার্য্যের বেবন্দবস্ত হইতেছে দেখিলে ব্যাঙ্ক কোম্পানিদিগকে তাহার উন্নতিরূপে পরামর্শ দিবেন, কিন্তু যদি তাহা অগ্রাহ্য করা হয় এবং ব্যাঙ্ক এরূপ বিবেচনা করেন যে কোম্পানি আপনার ধার ভাল করিয়া চালাইতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দেনি হইবে বিষয়ে নালিশ করিয়া হউক টাকা উসাইয়া লইবেন।

১০। কোম্পানিরা আপন কর্ম্মচারীর জন্য শিক্ষিত লোক (এণ্ট্রান্স কিম্বা অন্যূন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ) ভিন্ন নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে সমিতি সে লোক যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন।

১১। কোম্পানিদিগকে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম বিধি প্রণালী ও আপনাদিগের হিসাব পত্র রাখিতে হইবে।

১২। কোম্পানিরা যে সমস্ত জিনিসের কারবার করিবেন, তাহা করিতে তাহার বিক্রয় করিতে হইলে, সমিতির মারফৎ খরিদ করিবেন। আবশ্যক হইলে অন্যত্র হইতেও সমিতি সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আনাইয়া দিতে পারিবেন। এই খরিদের জন্য সমিতি শত করা কিছু কমিশন লইবেন।

১৩। জিনিস পত্র খরিদ ভিন্ন ব্যবসায়ের উন্নতি এবং কার্য্য সুচারুরূপে চলিবার জন্য সমিতি প্রয়োজন মত কোম্পানিদিগকে সকল প্রকার খবর দিবেন এবং সাহায্য করিবেন।

১৪। মোটের উপর কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হয়, নূতন২ শিল্পের প্রচার হয় এবং কৃষি সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হয়, সমিতি সর্ব্বদাই এই সমস্ত

বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং তাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য করিবেন।

১৫। দেশের কোন অংশের অবস্থা কিরূপ, কোথায় কিরূপ কার্য্য করিলে লাভ হইতে পারে, সমিতি সর্ব্বদা তাহার অনুসন্ধান করিবেন, এবং তথায় সে কার্য্য যাহাতে আরম্ভ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। আবশ্যক হইলে তজ্জন্য মূলধনও দিবেন।

১৬। ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য কোন কোন বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইতে পারি, তাহার উপর সমিতি সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, এবং তদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে দরখাস্ত করা কিম্বা অপর যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিবেন।

১৭। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কিম্বা দেশ হইতে চাঁদা উঠাইয়া স্বদেশ মধ্যে স্থানে২ যাহাতে কার্য্য শিক্ষার জন্য স্কুল কিম্বা কারখানা স্থাপিত হয় তাহার উপায় বিধান করা সমিতির একটি প্রধান কার্য্য হইবে।

১৮। আবশ্যক হইলে আপনাদিগের কার্য্যের সুবিধা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমিতি একখানি সম্বাদ কিম্বা সাময়িক পত্র প্রচার করিবেন।

১৯। দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার উদ্দেশ্যে বিশেষ২ ব্যক্তির দ্বারা লিখাইয়া সমিতি মধ্যে২ পাঠ্য পুস্তক ছাপাইবেন এবং বিতরণ কিম্বা বিক্রয় করিবেন।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাবটির উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও সন্দেহ হইবে না; কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না। আজকাল আমাদের মধ্যে দেশোন্নতির জন্য নূতন২ প্রস্তাবের কিছু কমি নাই, বোধ করি প্রায় প্রত্যহই এক একটি নূতন প্রস্তাব সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু কোন প্রস্তাবই এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা গেল না। সমস্ত কথা এবং পরামর্শ ঠিক হয়, কিন্তু দুষ্ট বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধিবার সময় হইলেই পরামর্শকারীরা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। সেই জন্যই বলিতেছি যে আমাদের এ প্রস্তাবের পরিণামও সেইরূপ হইবে কিনা, অর্থাৎ ইহা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক কিম্বা কার্য্যে পরিণত হইবার উপযুক্ত কিনা তাহা অগ্রে বিবেচনা করা উচিত।

আমাদের বিবেচনায় ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। প্রধান কথা আমাদিগকে এই দেখিতে হইবে যে ৬ লক্ষ টাকা কোথা হইতে উঠিবে। তাহার তিনটি উপায় আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম—আমাদের দেশে রাজা মহারাজা জমীদার বণিক প্রভৃতি অনেক গুলি ধনি বড় লোক আছেন। দেশের উপকার করিব বলিয়া ইঁহারা হয় কেহ একাকী কিম্বা সকলে একত্রিত হইয়া অনায়াসে ৬ লক্ষ টাকা দিতে পারেন।

দ্বিতীয়—কিম্বা রীতিমত ব্যবসা করিব বলিয়া জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির হিসাবে এই টাকা সংগ্রহ হইতে পারে।

তৃতীয়—কিম্বা উপরোক্ত দুই উপায় যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দেশের ধনি

দরিদ্র সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া ক্রমশঃ এই টাকা উঠান যাইতে পারে।

যদি প্রথম বিধা তৃতীয় উপায় দ্বারা টাকাটি সংগৃহীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হয়, তাহা হইলে ইহা একেবারে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবর্জ্জিত হইবে, ইহার যাহা কিছু উপসত্ব সমস্তই পূর্ণমাত্রায় দেশের কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার উপসত্বের অন্ততঃ কতক পরিমাণও যাহারা টাকাটি দিবেন তাহাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা বলি যে আমাদের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা এই উপসত্বের অর্থাৎ লাভের একটি অন্দাজি হিসাব নিম্নে দিতেছি।

৩ বাৎসরিক লাভ।

৬ লক্ষ টাকার মধ্যে তহবিল স্বরূপ হস্তে ১ লক্ষ রাখিয়া বক্রী ৫লক্ষ যদি ৫ হাজারের হিসাবে অন্ততঃ ১০০ মফস্বলস্থ কোম্পানিদিগকে ধার দেওয়া যায় তাহা হইলে শত করা ১ টাকার হিসাবে তাহার মাসিক সুদ————৫০০০ টাকা

১০০ শত কোম্পানীকে যদি নিয়মিতরূপে বিক্রেয় জিনিস পত্রাদি খরিদ করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে অন্তত এক হাজার টাকা গড়ে প্রতি কোম্পানীর হিসাবে মাসে ১ লক্ষ টাকার কম জিনিস হইবে না। তাহার উপর প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা কমিশন————————৩১২৫ টাকা

(আমাদের প্রস্তাবিত সমিতির ন্যায় একটি সম্ভ্রান্ত সমিতি যদি এরূপে কমিশন এজেন্সির কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাদের সংসৃষ্ট কোম্পানীরা ব্যতীত বোধ করি দেশের অনেক ব্যবসাদারেরা তাহাদের মারফৎ জিনিস খরিদ করিতে পারেন। তাহা হইলে এই কমিশনের আয় অনেক বর্দ্ধিত হইবে।)

মোট মাসিক আয়—৮১২৫৲

বাদ খরচ—

সমিতি এবং ব্যাঙ্কের এক জন সাধারণ ম্যানেজর ৫০০৲

১ জন সহকারি ম্যানেজর প্রত্যেক ২০০৲ করিয়া—৬০০৲

(এক জন সমিতির কার্য্য, এক জন ব্যাঙ্কের কার্য্য, এবং একজন এজেন্সির কার্য্য।)

৩ জনের অফিস খরচ প্রত্যেক ১৫০৲ করিয়া - ৪৫০৲

বাড়ী ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ—৫০০৲

আরও বেশী রাখা যাইতেছে৫০০৲

২৫৫০৲

মোট মাসিক লাভ—৫৫৭৫৲

১২

মোট বাৎসরিক আয়—৬৬৯০০

কোম্পানির কাগজে ৬ লক্ষ টাকা খাটাইলে বৎসরে ২৪ হাজার টাকার বেশী আয় হইবে না। তবে এক কথা এই হইতে পারে যে এক টাকা সুদে এত টাকা কে ধার লইবে? কিন্তু আমাদের দেশে টাকার

সেরূপ কষ্ট এবং অভাব তাহাতে ৬ লক্ষ টাকা এক দিনও পড়িতে পাইবে না। উচিত মত আয় বাখিয়া আবশ্যক হইলে সুদ কমাইয়া দেওয়াও যাইতে পারে। আর এক কথা এই হইতে পারে যে স্বল্প ব্যাঙ্কের কার্য্যই ভাল, কোন ঝঞ্ঝাট নাই, ইহার সঙ্গে আবার এজেন্সির কার্য্যের কি প্রয়োজন? কিন্তু আমরা কেবল মাত্র লাভের উদ্দেশ্যেই এই এজেন্সি কার্য্য করিতে বলি না, আমাদের মতে সমিতি কর্ত্তৃক এই কার্য্য সম্পাদিত হইলে সাধারণতঃ দেশের সমগ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। একত সমিতি সম্পূর্ণ সততার সহিত কার্য্য করিবেন, তৎপরে তাঁহাদের সাহায্যে অন্য অশেষবিধ সুবিধা এবং উন্নতি হইতে পারিবে।

আমাদের প্রস্তাবটি কি এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহা বলিলাম। আমাদের আবশ্যকীয় মূলধন—অর্থাৎ ৬ লক্ষ টাকা—উঠাইবার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যাহা বক্তব্য আছে তাহা অন্য বারে বলিব।

ক্রমশঃ

মাস সমালোচন।

দেশের শস্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ—কোথাও ভাল হইয়াছে বোধও হয় নাই। বর্দ্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় ত একেবারেই কিছু হয় নাই। তথাকার লোকদিগের এখনই অত্যন্ত অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিলক্ষণ কার্য্য খুলিতে হইয়াছে। মধ্যে ছোট লাট বাহাদুর স্বয়ং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থান সমুদয় পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য দেশশুদ্ধ লোক পরম প্রীত হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। ছোটলাট বাহাদুর স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে লোকের যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছে তাহা সামান্য; যে২ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতেই তাহার দূরীকরণ হইবে, আর কিছু বেশী করিবার প্রয়োজন নাই। ষ্টেটসম্যান, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী এবং বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রাদি দ্বারায় বিস্তর অবগত হওয়া যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তদপেক্ষা বেশী কিছু করিলে ভাল হয়। আমাদের নিবেদন যে গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কথা ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন, কেন না কষ্টের সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। এখন ধান্য কাটা হইতেছে মাত্র, কিছু দিন ইহা দ্বারায় লোকে কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিতে পারিবে, কিন্তু আর কিছু দিন,পরে যতদিন না আবার রবি কিম্বা ভাদ্রের শস্য হইতেছে, আবার কষ্ট আরম্ভ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

এই বর্দ্ধমান এবং বীরভূম দুর্ভিক্ষের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান মিরর

সিয়েসন, এবং বেঙ্গলি, সঞ্জবনী এবং বঙ্গবাসী সম্বাদ পত্রের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। এ বিষয়ে তাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে তাঁহারা যদি এরূপ না করিতেন তাহা হইলে লোকে যাহা কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকও পাইত না, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কোন প্রকারে দুর্ভিক্ষটা ছাপাইয়া ফেলিতেন।

দেশের স্বাস্থ্য এ বৎসর নিতান্ত মন্দ নহে। তবে নিম্ন বাঙ্গালায় স্থানেং সংক্রামক জ্বর এবং বিসূচিকা রোগ দেখা দিয়াছে। এই বিসূচিকা রোগ পূর্ব্বে প্রধানতঃ গরমের সময়ই হইত, এখন দেখিতেছি ইহা ক্রমে "বারমেসে" রোগ হইয়া দাঁড়াইল। ভারতবর্ষীয় লোকের বিপত্তি দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না!

গত মাস হইতে দেশের প্রধান সম্বাদ, লর্ডরীপনের ভারত পরিত্যাগ। এই এক কথাতেই সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, অন্যান্য সকল কথা ঢাকিয়া গিয়াছে। শীমলা হইতে কলিকাতায় আসিয়া লর্ডরীপন ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, যে স্থানে তিনি যাইতেছেন, কিম্বা এমন কি যে স্থান দিয়া তাঁহার স্পেশ্যাল ট্রেন চলিয়া যাইতেছে, তথায়ই দেশবাসীরা সকলে একত্রিত হইয়া মহা সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। কোন গবর্ণর জেনরেল কখন এরূপ আদর প্রাপ্ত হয়েন নাই, এবং ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে আর কোন কালে এরূপ একত্রীভূত জাতীয় উচ্ছ্বাস দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লর্ডরীপণ স্বদেশীয় দিগের হস্তে নানাপ্রকার অত্যাচার এবং নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে ভারতবাসীদিগের জন্য পূর্ণমাত্রায় আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার এরূপ অসাধারণ প্রশংসার একমাত্র কারণ। যে২ বিষয় তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয়ই যে তিনি সফল হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়াছেন,—কার্য্যেও যতদূর পারিয়াছেন করিয়াছেন আর বাক্যে দয়া এবং পক্ষপাতশূন্যতা ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ করেন নাই, এই জন্যই ভারতবাসীরা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্যই এরূপ উল্লাসের সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। ধন্য লর্ড রীপণ! কি শুভক্ষণেই তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কার্য্যত এখনই যদি তিনি আমাদের কোন বিশেষ উপকার করিয়া যাইতে পারিলেন না, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস শাসন-নীতিতে তিনি যে অকৃত্রিম উদারতার ভাব প্রবিষ্ট করিয়া গেলেন এবং দেশের লোকের হৃদয়েতেও তিনি যে প্রকার মনুষ্যোচিত স্বত্ব স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রবৃত্তি উদ্রেক করিয়া গেলেন তাহাতেই ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অশেষ উপকার সাধিত হইবে এবং তজ্জন্য চিরকালই তাঁহার নাম লোকের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

লর্ডরীপণ কি প্রকার প্রকৃত ভারতবন্ধুর ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রাজত্বের প্রত্যেক কার্য্যেই চমৎকার রূপে বিভাষিত। গত মাসে দুই

একটি বিষয় যাহা ঘটিয়াছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১ম—তাহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের উপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য।

যে স্বভাবসিদ্ধ দয়া, উদারতা, এবং মহানুভবত্ব লর্ডরীপণের চরিত্রের প্রধান অঙ্গ তদ্বারাই প্রণোদিত হইয়া তিনি ভারতবর্ষীয় শিক্ষা প্রণালী আদ্যোপান্ত আলোচনা করিবার এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য অদ্য ৩ বৎসর হইল একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কমিশন প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং নানাস্থানে নানাবিধ অনুসন্ধান করিয়া একটি সবিস্তার রিপোর্ট প্রদান করেন। সেই রিপোর্টের উপরই উপস্থিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে। কমিশন অনেক অত্যুত্তম বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহা উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডাইরেক্টরেরা যে শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করেন তদনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইয়াছে; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দেশের মধ্যে কেবল মাত্র ৫০৯৯৮ বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে ৯,২৩,৭৮০ ছাত্র পাঠ করিত, কিন্তু ১৮৮০তে বিদ্যালয় সংখ্যা ১,১৪,১০৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ২৬,৪৩,৯৭৮ হইয়া গিয়াছিল এবং সে উভয় সংখ্যাই আজ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা তুলনায় উন্নতি খুব হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি এখনও অনেক বাকি আছে; এমন কি যাহা হওয়া উচিত এখনও তাহার দশমাংশও হয় নাই। বিগত সেন্সস দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের সমগ্র লোক সংখ্যা ধরিয়া হিসাব করিলে সহস্র পুরুষের মধ্যে এখনও কেবল মাত্র ১০৪ জন লোক পাওয়া যায় যাহারা লিখিতে এবং পড়িতে পারে। অতএব ইহা হইতেই বিবেচনা করা যাইতে পারে যে লোক শিক্ষা বিষয়ে এখনও কতটা কার্য্য বাকি আছে। শিক্ষা কমিশন এই বিষয় বিষদ রূপে বুঝাইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি তাহা সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মন্তব্যে কমিশনের সমস্ত যুক্তি এবং উপদেশের অনুমোদন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১ম। দেশের মধ্যে খাস দেশীয় প্রণালীর যতগুলি বিদ্যালয় আছে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা উৎসাহিত করা।

২য়। দেশের সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের জন্য প্রাইমারি শিক্ষার সমধিক প্রচার করা। ইহার জন্য যাহা কিছু করিতে হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে প্রস্তুত হইবেন, দেশের লোকের সাহায্য কিম্বা চেষ্টায় প্রত্যাশা করিবেন না;

৩য়। কলেজ, হাইস্কুল এবং সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল (যাহা ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়) এ সমস্তে গবর্ণমেণ্ট

পূর্ব্ববৎ সাহায্য করিবেন, কিন্তু দেশের লোক স্বয়ং এসমস্ত স্থাপনের জন্য ব্রতী না হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বইচ্ছায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না।

আমাদের বিশ্বাস যে রাজা এবং প্রজা উভয়েই যদি বাস্তবিক আন্তরিকতার সহিত শিক্ষা কমিশন কর্ত্তৃকনির্দ্দিষ্ট এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইহা হইতে ভবিষ্যতে আমাদের অশেষবিধ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। "উচ্চশিক্ষা" উঠিয়া গেল বলিয়া যে আমরা সময়ে সময়ে কোলাহল করিয়া থাকি, সেটা আমাদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ ন্যায়সিদ্ধ নহে। এবিষয়ে যে গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবেন না - একেবারে হাত গুটাইয়া লইলেন তাহা সত্য নহে, গবর্ণমেণ্ট বলেন যে উচ্চশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের জন্য আর সে লোকেরাও উচ্চশ্রেণীস্থ—বুদ্ধিমান, বিবেচক, এবং আপন হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন, তাহারা আপনা হইতেই আপনাদিগের শিক্ষার উপায় করিবে, এবং তাহার উপর যখন আবার গবমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহাদের সে শিক্ষার হানি হওয়ায় সম্ভাবনা কি? কিন্তু এদিকে ১৫ আনা লোক অজ্ঞ, গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ সাহায্য না করিলে তাহাদের সে অজ্ঞতা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই; আর তাহা দূর না হইলে ও কোন কালে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের যত ক্ষমতা আছে তাহার অধিকাংশটা ইহাতেই প্রযুক্ত করা কি কর্ত্তব্য নহে? আমাদের বিবেচনায় ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি এবং লর্ড রীপণ যে ইহা প্রবর্ত্তিত করিয়া গেলেন তজ্জন্য তিনি আমাদিগের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

দ্বিতীয়। গত মাসে ইণ্ডিয়া গেজেটে বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের জমী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা তৎপ্রদেশবাসীদিগের অসাধারণ মঙ্গল এবং উপকার সাধিত হইবে। এক বাঙ্গালাতেই লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত প্রদেশে নিয়ম এই যে ৩০।৪০ বৎসর অন্তর এক-একটী নূতন বন্দোবস্ত হয়, এবং জমীদারদিগকে তদনুযায়ীক খাজনা দিতে হয়। এই বন্দোবস্ত ভয়ানক ব্যাপার। ইহাতে প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার এবং উৎপীড়ন হইয়া থাকে, এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই তাহারা কখন আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না। উত্তর পশ্চিম মধ্যভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্থানের প্রজারা যে রূপ নিস্বঃ এবং সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ইহাই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু লর্ড রীপণ উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারা এক প্রকারে এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাৎ করিয়াছেন। এখন হইতে নিয়ম হইয়া গেল যে বন্দোবস্তবিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা আর এরূপে মধ্যে মধ্যে নূতন বন্দোবস্ত হইবে না; যে বন্দোবস্ত একবার হইয়াছে তাহার সময় অতীত হইলেও, কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত না হইলে বরাবরের জন্য তাহাই সাব্যস্ত থাকিবে।

সাধারণ প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য লর্ড রীপন যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন তন্মধ্যে এই কার্য্যটী একটি প্রধান।

তৃতীয়—স্যালেম কয়েদীদিগের মুক্তি।

হাইদ্রাবাদ যাইবার সময় লর্ড রীপন যখন মান্দ্রাজ হইয়া যান তখন সালেমের প্রায় সহস্রাধিক ভাল ভাল অধিবাসী একত্রিত হইয়া এই কয়েদীদিগের কারামুক্তির জন্য আবেদন করিয়াছিল। লর্ড রীপন তখন বলিয়াছিলেন যে, মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেবের অনুজ্ঞায় যখন মোবদ্দনা হইয়াছে, এবং হাইকোর্টের হুকুমত যখন বন্দিরা শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার আর এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই—তিনি কিছুই করিতে পারেন না। লর্ড রীপণের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া সমগ্র দেশের লোকটা হতাশ্বাস হইয়া গিয়াছিল ভাবিয়াছিল সালেম বন্দিরা আর আন্দামান হইতে ফিরিতে পাইবে না, আর তাহাদের দুঃখী স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা তাহাদের মুখাবলোকন করিতে পাইবে না। এই ভাবিয়া লোকের দুঃখের এবং বিষাদের আর সীমাপরিসীমা ছিল না। দিন কতক "হা হুতাশ" করিয়া ক্রমশঃ সকলে নীরব হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন সম্বাদ আসিল যে বিলাত হইতে বন্দিদিগের কারামুক্তির হুকুম আসিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথা হইতে কি হইল? এ অঘটন কে ঘটাইল? এ "আকাশের চাঁদ কে হাতে আনিয়া দিল?" কে আর দিবে?—সেই মহামতি লর্ড রীপন, যিনি ভারতবাসীকে বরাবর পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, এবং সহস্র নির্য্যাতন সত্ত্বেও যিনি কখন আপন কর্ত্তব্যের পথ হইতে এক ইঞ্চিও পথান্তর গমন করেন নাই। ঘোর অবিচার এবং অত্যাচার হইয়াছে বুঝিয়া লর্ড রীপন বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটরীকে এ বিষয়ে রিপোর্ট করেন এবং বন্দিদিগের মুক্তির জন্য তাঁহার হুকুম আনাইয়া লয়েন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লিখিত হইয়াছিল যে, গবর্ণর সাহেব দয়া করিয়া বন্দিদিগকে কারামুক্ত করিলেন। তা বটেইত, লর্ড রীপণ না থাকিলে কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিত, কে তাহাদিগকে স্ত্রী পুত্রের ক্রোড়ে আনিয়া দিত তাহা আমরা দেখিতাম।

আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধে গত মাসের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই উল্লেখ করিতে পারি, তাহা না হইলে লর্ড রীপণের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য আমরা আরও অনেক গুলি বিষয়ের কথা বলিতাম। লর্ড রীপনের নামোল্লেখমাত্রেই আমাদের হৃদয় এরূপ পূর্ণ হইয়া আসে, যে বোধ করি সাত দিন সাত রাত্রি বকিলেও আমাদের সে পূর্ণহৃদয়ের একটি কোণও খালি হয় না।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনেও গত মাসে অনেক গুলি অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আবকারি কমিশনের রিপোর্ট, আড়ংঘাটা রেলওয়ে দুর্ঘটনার তদারক, মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন, ইত্যাদি। সে সমস্তই প্রায় এত প্রয়োজনীয় বিষয় যে বাস্তবিক বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের দ্বারা আমরা পাঠকবর্গকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এস্থলে মোটের উপর একটা সুসম্বাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালায় আজ কাল সকল বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইতেছে, কোন কথা—রাজপুরুষদিগের কোন অভিপ্রায়ই লুক্কায়িত থাকিতে পায় না, সেই জন্যই হউক কিংবা অপর যে কারণেই হউক, দেখা যাইতেছে যে আমাদের বৃদ্ধ ছোট লাঠ বাহাদুরের মেজাজটা ইদানীং একটু নরম হইয়া আসিয়াছে, এখন প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই তিনি যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করিতেছেন এবং সাধারণ মতেরও কথঞ্চিৎ সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন তাঁহার এই ভাবটি কিছুকাল—অন্ততঃ যতদিন তিনি বাঙ্গালার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর থাকেন ততদিন বর্ত্তমান থাকে, যেন ডিফেন্স আসোসিয়েসনের কুহকে পড়িয়া আবার তাঁহার মন বিচলিত না হইয়া যায়!

PRINT AND PUBLISHED BY NEROD CHUNDER MUKERJEE. AT THE DURBHUNGA TRADING CO.'s, "UNION PRESS."

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন১২৯১ সাল; কার্ত্তিক, ১ম পক্ষ। [১৯ সংখ্যা।

সিদ্ধান্তবাগীশের টোল।

(১) সৃষ্টিসমন্বয়।

হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টিকে অনাদিও কহেন, সাদিও কহেন। এই দ্বিবিধ মত লইয়া সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্যগণকেও বিবাদ করিতে দেখা যায়। আবার ইহার মধ্যে একটু রইলও আছে। শাস্ত্রে সৃষ্টিকে অনাদি বলে এই কথা শুনিয়া এই বর্ত্তমান কালের অনেক নাস্তিক প্রশ্রয় পাইয়াছেন এবং অনেক ব্রাহ্মও শাস্ত্রের তাদৃশ উক্তির প্রতি অনাদর করিতেছেন। এই সকল সংশয় ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

মানব যেমন ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি বশতঃ বুদ্ধিচালনা পূর্ব্বক কোন বস্তু রচনা বা কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন, পরমেশ্বর সেরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা বা কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি সহকারে কিছুই সৃষ্টি করেন না। ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিলে তজ্জনিত শোক বা হর্ষ যেমন কর্ত্তাকে স্পর্শ করেনা এবং যেমন সেই কারণে তাদৃশ কর্ত্তা শাস্ত্রানুসারে অকর্ত্তা শব্দের বাচ্য, পরমেশ্বর স্বীয় ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অপেক্ষা নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করায় সেইরূপ অকর্ত্তা বলিয়া কথিত হয়েন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্প্রজায়েয়েতি। সতপোঽতপ্যত। সতপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।" সেই পরমাত্মা ('অকাময়ত' কামিতবান্) কামনা করিয়া ছিলেন যে প্রজাদ্বারা আমি বহু হইব। তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় এইরূপ আলোচনা করিয়াছেন ('তপঃ অতপ্যত' জগৎসৃষ্টিবিষয়মালোচনামকরোৎ)। আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। ('অসৃজত' সৃষ্টবান্।) এইরূপে যদিও বেদে জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত পরমাত্মার কামনার উল্লেখ আছে, কিন্তু মহর্ষি ব্যাসদেব বেদান্ত মীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্নবৈশেষ্যাৎ" (১।২।৮)। জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের কর্ম্ম জন্য সম্ভোগের প্রাপ্তি নাই। সম্ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে বা কর্ম্মভোগ পরতন্ত্র হইয়া তিনি সৃষ্টিরূপ ক্রিয়া করেন না। কেননা তাঁহার চিৎশক্তি এতাদৃশ দেদীপ্যমান যে তাহাতে স্বার্থ স্থান পায় না। আরো বলিয়াছেন "কর্ম্মফলবত্ত্বেন ভোগাদিভ্য"

(২।২।৪০)। ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয় সকল স্বস্ব স্বতন্ত্র শক্তি দ্বারা জীবের বাসনাকে পীড়ন করাতে জীবের ভোগাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদের স্বতন্ত্র শক্তি বিদ্যমান নাই। অতএব তাঁহাতে ভোগাদি দোষ স্পর্শে না। ("তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকঃ" বীতশোক পুরুষ সেই বিষয়ভোগ সঙ্কল্প রহিত পরমেশ্বরকে দর্শন করেন)। গীতাস্মৃতিতে কহিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। তস্য কর্ত্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥ নমাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি নমেকর্ম্ম ফলেস্পৃহা। ইতিমাং যোহভি জানাতি কর্ম্মভির্ন সবধ্যতে॥ প্রলয়েলীন নিরুদ্ধবৃত্তি-গত জীবগণের প্রকৃতি অর্থাৎ গুণকর্ম্ম সকলের বিভাগ অনুসারে চারি প্রকার বিশিষ্ট মনুষ্যলোক আমার সৃষ্ট। যদিও আমি তাদৃশ সৃষ্টির কর্ত্তা, কিন্তু আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। কেননা আমি অব্যয়। আমার কোন অভাব জন্য আসক্তি নাই। বিশ্বসৃজনাদি কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না। যেহেতু আমি পূর্ণকাম ও ভোগেচ্ছা রহিত প্রযুক্ত আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। আমাকে এই তাৎপর্য্যে অকর্ত্তা বলিয়া যে জানে, সে ব্যক্তি কর্ত্তা কর্ম্মের নিগূঢ়ার্থ লাভ করায় আর কর্ম্মে বদ্ধ হয় না।' এতাবতা পরমেশ্বর কামনা পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিলেও সে কামনার অর্থ ভোগেচ্ছা নহে। এবং তিনি জগতের কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মফল ভোগে নির্লিপ্ততা জন্য অকর্ত্তা শব্দের বাচ্য। এই রূপ ভোগরাহিত্য এবং নির্লিপ্ততা জন্য যেমন পরমেশ্বর জগতের কর্ত্তা নহেন, সেইরূপ তিনি ইষ্টসাধনতৎপরা বুদ্ধি চালনা পূর্ব্বকও জগৎ সৃষ্টি করেন না। বিশেষতঃ বেদে কহেন ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার করণ-শক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান নাই। "অপ্রাণোহ্যমনাঃ" স্বরূপতঃ তিনি 'অপ্রাণঃ' অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকোবায়ুর্যস্মিন্ অসাবপ্রাণঃ। ক্রিয়াশক্তি ভেদবান্ চলনাত্মক্ প্রাণবায়ু তাহাতে বিদ্যমান নাই, সুতরাং তিনি প্রাণবিহীন। আর "অমনাঃ" অনেক জ্ঞান শক্তি ভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনো যাবিদ্যমানং যস্মিন্ সোহমমনাঃ। বিবিধ প্রকারে বিক্ষিপ্ত জ্ঞানশক্তি ভেদাত্মক্ সঙ্কল্প বিকল্প বিশিষ্ট মন ও তাঁহাতে বিদ্যমান নাই। সুতরাং তিনি মনোবিহীন। এস্থানে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন 'অপ্রাণোহ্যমনাশেতি প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, তদ্বিষয়াশ্চ, তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধিন্দ্রিয়াণি, তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধান্যেদিতব্যাঃ'। এই শ্রুতিতে প্রাণ মনের প্রতিষেধে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় তথা বুদ্ধি ও তাহার বিষয়েরও প্রতিশেষ বুঝিতে হইবেক। অতএব পরমেশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি করণ গত নহে কিন্তু স্বীয় স্বভাবগত। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। মানব যদি কোন বিষয় রচনা করেন, তবে সে কার্য্যে তাঁহার বিবেচনা ও বুদ্ধিচালনার প্রয়োজন হয়। কেন প্রয়োজন হয়? একথার উত্তর এই যে, যে কার্য্য সাধনে স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকে তাহাতেই বুদ্ধিব্যয় হয়। যদিও লৌকিক দৃষ্টান্তে বুদ্ধি ব্যয়পূর্ব্বক কার্য্যের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় এবং তৎকর্ত্তাকে লোকে উচ্চব্যক্তি বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অভাবতঃ সুকর্ত্তাই আর সবিবে

ও তৎকর্ত্তাকে লোকে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া থাকে। বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্য কারীর বুদ্ধি সাংসারিক বুদ্ধি মাত্র—তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে মহত্তত্ত্ব বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যিনি স্বভাবতঃ কার্য্য করেন, তিনি সাংসারিক বুদ্ধিকে স্পর্শও করেন না। সুতরাং তাদৃশ স্বভাবকে বুদ্ধি বলা লম্ব হয় না। তাহা মহত্তত্ত্ব" শব্দের বাচ্য। প্রয়োজনোপযোগী স্বভাব যাহার আয়ত্বে না থাকে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধি চালনা দ্বারা সেই অভাবের কিয়দংশ পূরণ করিতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধি কৃত কবিতার মাধুর্য্য কোথা? অতএব স্বভাবেরই মহত্ত্ব - বুদ্ধির নহে। কিন্তু বুদ্ধি কৃত কার্য্যের ন্যায় স্বভাবতঃ কৃতকার্য্যে কর্ত্তার কর্তৃত্ব থাকে না। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত পরমেশ্বরেতে প্রযোগ করিলেই বুঝা যাইবে যে এই জগৎসৃষ্টি করিতে তাহার বুদ্ধি ব্যয় হয় নাই। তবে কিরূপে সৃষ্টি করিলেন? একথার উত্তরে শ্রুতিতে কহিয়াছেন —"নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাশ্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ"। তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ করণ নাই। কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয় এবং জ্ঞান ক্রিয়া এবং বলক্রিয়া ইঁহার স্বভাব সিদ্ধ। ফলে উক্ত জ্ঞান কি বুদ্ধি নহে? ইহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলেন—বুদ্ধি বলেন না। বুদ্ধি স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইলেও স্বভাবকে অতিক্রম করে না, কিন্তু মহত্তত্ত্ব কেবল [illegible] তবে সিদ্ধ দিগকে [illegible] অভাবে

নববুদ্ধিকেও স্থানে স্থানে মহত্তত্ত্ব কহিয়াছেন এবং ঈশ্বরীয় মহত্তত্ত্বকেও বুদ্ধি কহিয়াছেন। এতাবতাঃ পরমেশ্বর স্বভাবতঃ এই সৃষ্টি সংহারাদি করেন। স্বীয় ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্য প্রবৃত্তি বশতঃ অথবা স্বাভাবিকী জ্ঞান শক্তি বা ক্রিয়াশক্তির অভাব জন্য বুদ্ধি চালনা পূর্ব্বক কিছু করেন না। সুতরাং তাদৃশ কার্য্যে তাহার কর্তৃত্ব নাই। অর্থাৎ তিনি তাহার কর্ত্তা হইয়াও যেন অকর্ত্তা। গীতাস্মৃতিতে কহিয়াছেন " সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্প ক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূত গ্রামমিমং কৃৎস্ন মবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ নচমাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরং। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ " হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয় কালে সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে লীন হয়। পুনঃ 'কল্পাদৌ' কিনা সৃষ্টি কালে আমি সেই সকল ভূতকে স্থূল সূক্ষ্মাদি নানারূপে সৃজন করি। এই কথায় মনে করিতে পার "অসঙ্গ নির্ব্বিকারশ্চত্বং কথং সৃসজি?" তুমি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার তবে কি প্রকারে সৃষ্টি কর? তাহাতে কহিতেছেন যে, সৃষ্টিশক্তি স্বরূপিনী আমার যে প্রকৃতি মহাপ্রলয়কালে সাম্যাবস্থায় থাকেন, আমি তাঁহাতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাদৃশ প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের অন্তে সৃজন করি। উক্ত প্রকৃতি আমারই স্বীয় সৃষ্টিশক্তি বিধায় আমি তাঁহার মায়ায় মোহিত হইনা, কিন্তু যে সমস্ত ভূত প্রলয়কালে আমার সেই শক্তিতে লীন থাকে,তাহারা 'অবশ' অর্থাৎ

সম্পূর্ণরূপে ঐ শক্তির বশীভূত। কেননা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যে কোন ভূত ঐ শক্তির যে কোন প্রভাবে বদ্ধ থাকে বা তৎপ্রভাব বশতঃ কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে জীব যেমন সুকৃতি দুষ্কৃতি উপার্জ্জন করে তাহা ঐ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। যে যেমন কর্ম্ম করে আমার ঐ সৃষ্টি শক্তিই ব্যষ্টিভাবে অদৃষ্ট বা স্বভাব রূপে তাহার ভাগ্যস্থানে থাকেন। সেই স্বভাবরূপ অদৃষ্ট লইয়া ভূতগণ প্রলয়কালীন সৃষ্টিশক্তিরূপিনী পরমা প্রকৃতির গর্ভে অবশ হইয়া বাস করেন। পুনঃ সৃষ্টিকালে আমি তৎপ্রতি ঈক্ষণ করিলেই সৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাহাতে আমি কোন ফলাকাঙ্ক্ষা বা বুদ্ধি চালনা করি না। তাহা করিলে বিপর্য্যয় হয়। আমার সৃষ্টি শক্তিতে যাহা আছে তাহার অন্যথা হয়, যাহার যে স্বভাব তাহার ব্যতিক্রম হইয়া যায়। অতএব সেই শক্তি অনুসারে অর্থাৎ স্বভাবতঃ আমি পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকি। এস্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পার "এবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তবজীববদ্বন্ধঃ কথং নস্যাৎ" এপ্রকার নানাবিধ কর্ম্মের কর্ম্মী যে তুমি, তোমার জীবের ন্যায় কর্ম্মবন্ধন কেন হয় না? ইহার উত্তরে কহিতেছেন যে হে ধনঞ্জয়, সেই কর্ম্ম সকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। কেননা কর্ম্মেতে যে আসক্তি তাহাই বন্ধনের কারণ। কিন্তু আমি পূর্ণকাম বিধায় সে আসক্তি আমার নাই। আমি যদিও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নহি, কিন্তু আমার সেই সকল কর্ম্মে ফলাসক্তি নাই বলিয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া থাকি। আমি সুকৃতি দুষ্কৃতিরূপ ফলসম্বন্ধরহিত ও কর্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করি। কিন্তু কোশকারকীটের ন্যায় মূঢ়েরা যেমন আপনার কর্ম্মে বদ্ধ হইয়া পড়ে আমি তদ্রূপ হই না। উপরিউক্ত প্রকৃতিনাম্নী আমার সহকারিণী সৃষ্টিশক্তি আমার অধ্যক্ষতাহেতু এই বক্তাব্যক্তাত্মক বিশ্ব সংসার উৎপন্ন করে এবং আমারই কর্তৃত্বাধীনে উহা বারম্বার প্রকাশ পায়। অতএব যখন আমি ফলস্পৃহাতে বা বুদ্ধি পূর্ব্বক সৃষ্টিক্রিয়া করিনা, তখন, সুতরাং আমি উদাসীন, অথচ অধ্যক্ষ ও অধিষ্ঠাতা বিধায় কর্ত্তাও বটি। এতাবতা শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বরকে জগতের কর্ত্তাও বলা যায় এবং তাঁহার ফলাশক্তি ও বুদ্ধিক্রিয়া না থাকায় অকর্ত্তাও বলা যায়। তাহার সহকারিনী সৃষ্টিশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিই যখন বিশ্বসংসারের বীজ এবং তিনি পরমেশ্বরেরই শক্তি বিধায় নিত্যা "নিত্যং সদসদাত্মকং," তখন তাহা হইতে এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে উৎপন্ন হইবে এবং বারম্বার জগৎ লয় ও প্রকাশ পাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সুতরাং কর্ম্মীরা যে জগৎকে নিত্য বলেন সে কথায় কোন দোষ নাই। আবার প্রত্যেক জীবের সৃষ্টি ধরিয়া পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা এবং স্বতন্ত্রসত্তা বিরহিতা তাঁহারই সৃষ্টিশক্তির সহকারিতা স্মরণ পূর্ব্বক জগজ্জন্মাদিবাদীরা এই সৃষ্টিকে যে ঈশ্বরকৃত বলেন তাহাতেও দোষ নাই। পুনশ্চ তিনি কেবল অধ্যক্ষমাত্র সুতরাং উদাসীন, কর্ত্তাবিধায় তাঁহাকে বিশেষ করিয়া না ধরিয়া যাঁহারা প্রকৃতিকেই জগজ্জননী বলেন তাঁহাদের সে কথাতেও দোষ নাই। এমন কি, যে সকল ধার্ম্মীরা জীবগণের কর্ম্মফলপাত্তরব্যাপি [illegible]

উপার্জ্জিত অদৃষ্টরূপি স্বভাবকে স্মরণ পূর্ব্বক সৃষ্টির তদনুগত স্বাভাবিক আবির্ভাব ও ভোগক্ষয় জন্য তত্তীরোভাব প্রদিপাদন করেন তাঁহাদেরও কথাতে কোন দোষ দেখি না। কেবল কথার মর্ম্ম না বুঝিতে পারাই দোষের মূল। এতাবতা সৃষ্টির প্রকট অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহাকে সাদি বলা যায় এবং পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও প্রলয়শীল বিধায় তাহাকে অনিত্য অথচ প্রবাহরূপে নিত্য বলা যায়। এই প্রবাহ রূপ নিত্যত্ব পরমেশ্বরেরই নিয়মাধীন। সুতরাং তিনিই মূল কারণ। সে দৃষ্টিতে ইহাকে সাদি বলিতে হইবে। কিন্তু সে নিয়মের আরম্ভকাল ধরা অসাধ্য এজন্য জগৎকে অনাদি বলা গিয়া থাকে। "নকর্ম্ম-বিভাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ" (শারীরকে) কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট এবং সৃষ্টি এ উভয়ের কার্য্যকারণত্বরূপে আদি নাই। কর্ম্ম প্রকৃতিরই বিকার। তাহাই সুকৃতি দুষ্কৃতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মপদবাচ্য। তাহাই অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট অর্থাৎ প্রকৃতির সমষ্টি বলে ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির তপস্যা হয়। তথাচ মন্ত্রবর্ণে— "ততো মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে তপসোঽদৃষ্টবলাৎ সমুদ্রোঽজায়তে।" মহা-প্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে পরমেশ্বরের তপস্যা দ্বারা অদৃষ্টবলে সমুদ্র জন্মিল। অর্থাৎ "কীদৃশাত্তপসঃ? না "অভীদ্ধাৎ," 'অভি' সর্ব্বতোভাবেন 'ইদ্ধাৎ' লব্ধবৃত্তেঃ, প্রলয় সময়েহি নিরুদ্ধবৃত্ত্যাদৃষ্টং ভবতি"। প্রলয়লীন ভূতগণের নিরুদ্ধবৃত্তিস্বরূপ অদৃষ্ট-বলে মহদাদিক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত জন্মিল। "যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথোস্বঃ" (ইতি মন্ত্রাবর্ণে) যেরূপ ভাবে পূর্ব্বকল্পে সৃষ্টি ব্যবস্থাপিত ছিল সেই রূপেই আকাশ, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গাদি ক্রমে সৃষ্টি পুনঃ প্রকটিত হইল। পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্ট-রূপ স্বভাবই অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি। তাহা মূলপ্রকৃতি বা সমষ্টি মায়াতে সমন্বিত। তাহা নিত্য, তাহাই ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি। তাহাই বিশ্ববৃত্তি সম্পন্ন। সেই সৃষ্টিশক্তির অনাদিত্ব, নিত্যত্ব ও বিশ্ববৃত্তিত্বতেই জগ-তের কল্পকল্পান্তরব্যাপী প্রবাহরূপী নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পরব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি অনিত্য হইতে পারে না। সৃষ্টি সহস্র অনিত্য হইলেও তাহা সেই বীজের গুণে কর্ম্মাধিকারে নিত্য হইতেছে। একাদিক্রমে নিত্য নহে, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য হই-তেছে। এইরূপে সৃষ্টির সাদিত্ব ও অনাদি-ত্বের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। কেবল সাদি বলিলেও হইবে না, কেবল অনাদি বলি-লেও চলিবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

কাননবালা।

(গার্হস্থ্য কথা।)

উপক্রমণিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কৃষ্ণএকাদশী—রাত্রি দুই প্রহর হইতে অধিক বিলম্ব নাই, বনভীপল্লী নীরব, গ্রাম্য পথ অন্ধকারে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ঝোপের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পথ চিনা যায় না, স্থানে স্থানে দুই একটা কুক্কুর দুই একবার ডাকিতেছে, দুই একটা ঝোপ দুই একবার নড়িয়া উঠিতেছে। গৃহস্থগণ সকলে নিদ্রিত।

পথ, গ্রাম সকলি নীরব—কিন্তু এক স্থানে এই ক্ষুদ্র পল্লীর এমন স্থির নিশ্চলতা ভঙ্গ করিয়া মৃদু অস্পষ্ট ভাষায় কি কথপোকথন হইতেছিল;—কথাগুলির ভাবে বোধ হইতেছিল কোন ব্যথিত চিত্তের মর্ম্মবেদনার পরিচয়—বড় সককণ—বড় হৃদয় বিদারক! যেখানে এইরূপ কথপোকথন হইতেছিল, সেটা একটা উদ্যান, পল্লীগ্রামে যেমন উদ্যান সম্ভব ইহা তদপেক্ষা বিশেষ সৌষ্ঠবসম্পন্ন, এমন কি সহরাঞ্চলেও তদনুরূপ উদ্যান সচরাচর দৃষ্ট হয় না। উদ্যানের চতুর্দ্দিক সুন্দর কারুকার্য্যময় রেলিংএ বেষ্টিত। মধ্যভাগে একটী অনতিদীর্ঘ স্বচ্ছ নীলোদক-শোভিত অপূর্ব্ব সোপান-মণ্ডিত পুষ্করিণী, উদ্যানে বেড়াইবার জন্য যে পথগুলি ছিল সে গুলি বেশ পরিষ্কার, একটু বিস্তৃত ও তাহার পার্শ্বে ঠিক সমান ভাবে পুষ্পবৃক্ষ রোপিত ছিল। স্থানে স্থানে আম্র, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি সুফল বৃক্ষেরও অসদ্ভাব ছিল না। পুষ্করিণীর ঘাটের উপরে একটু দূরে দুই পার্শ্বে দুইটী বটবৃক্ষ, তাহার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বকুলবৃক্ষ বড় সুন্দরভাবে রোপিত ছিল—তাহার সম্মুখে ঘাটের উপরে লতামণ্ডপ—বড় স্নিগ্ধকর, বড় মনোরম। উদ্যান প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী ঝাউ বাতাসে শোঁ শোঁ করিতেছিল—রেলিংএর ধারে ধারে আরো স্থানে স্থানে ঝাউগাছ ছিল, কিন্তু তাহারা এখনো ক্ষুদ্র বলিয়া বড় শব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। সাধারণতঃ উদ্যানটী বেস মনোমুগ্ধকর প্রকৃতিপুঞ্জের আবাসস্থল ছিল। সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিলে, চিন্তোৎক্ষিপ্তহৃদয় সুস্থির হইত; চন্দ্রকরস্পর্শে সে উদ্যানের শোভা দেখিলে জড়হৃদয়ও উৎফুল্ল হইত; কিন্তু আজ তাহার কিছুই

নাই—আজি ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীর তমসদেহে উদ্যান অপূর্ব্ব শোভা সহ লুক্কায়িত রহিয়াছে!

সেই উদ্যানের পুষ্করিণীচাতালে মুঞ্জন-লতাকুঞ্জে দাঁড়াইয়া—দুই জন। দুই জনই স্ত্রীলোক অর্দ্ধ বয়সী, তাহাদেরই কথোপ-কথন হইতে ছিল। সে কথা কি পাঠক শুনিবেন? এমন পুষ্করিণীর চাতাল, এমন রম্য উপবন, এমন সুন্দর কুঞ্জে যুবকের সমাগম নাই—যুবতীর লজ্জা বিহ্বল কথা নাই। তাই বলিতেছিলাম, পাঠকের এ দৃশ্য কি ভাল লাগিবে?

রমণীদ্বয় যে শুদ্ধ অর্দ্ধ বয়সী তাহা নহে, আবার তাহাদের পরিধেয় বসন অন্যবিধ ছিল, গাত্রে অলঙ্কারের চিহ্ন নাই, তাহারা বিধবা।

উভয়েই বিধবা হউন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য ছিল। এক জনের বস্ত্র অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত—শরীর অতি শীর্ণ, কেশরাশি বিবর্ণ—অবদ্ধ, চক্ষু বিবর্ত্ত প্রবিষ্ট অথচ তেজঃব্যঞ্জক, ললাট ঈষদুন্নত, বক্ষঃ জীর্ণ—অস্থি দৃশ্যমান। গাত্রের বর্ণ উত্তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ, এত চিন্তাক্লিষ্ট এত সন্তপ্ত তথাপি সে সৌন্দর্য্যদীপ্তি সেইরূপ পরিস্ফুট। দেখিলেই ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হয়! অপরা মধ্যমাকৃতি, বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, কেশ সেইরূপ অবদ্ধ, বস্ত্র শুভ্র, ক্রোড়ে শিশু সন্তান।

প্রথমা রমণী আমাদের পূর্ব্বকথিতা অপর্ণাদেবী।

অপর্ণাদেবী গাঢ়স্বরে কহিলেন,—

"ভগিনি! সরলা আমার দুধের সন্তান, আমি ভিন্ন আর যে কেহ তাহার আপনার আছে তা সে জানে না—সে কি রূপে আমায় ত্যাগ করিয়া থাকিবে? আমার যেখানে গতি তারও সেখানে গতি, অবোধ বালিকা মা ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে?"

বসুন্ধরা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিলেন,—

"তবে কি হইবে? এমন অবগুণ্ঠিশিশু লইয়া কোথায় ভাসিবে? কে আছে, কাহার কাছে গিয়া দু'দিন জুড়াইবে? পিত্রালয়ের ঐ দশা, স্বামীগৃহেরও ত এই হইল! শেষে দেবর, যাকে এতকাল পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া পালন করিলে, আজি স্বচ্ছন্দে ভ্রাতার অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় হস্তগত করিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিল।"

অপ। "ভগিনি! আমাকে বনবাসিনী পথের ভিখারিণী করিয়া যদি তিনি সুখী হন—হউন, তিনি আমার স্বামীর সহোদর, আজিও তিনি যেমন স্নেহের পাত্র কালিও তাহাই থাকিবেন,—তাঁহার ভ্রাতার ধন তিনি লইয়াছেন, তাহাতে দুঃখিত হইব কেন? কিন্তু যাহাকে এতকাল পুত্র-ভাবে পালন করিলাম—তিনি যে এ বাজ বুকে হানিবেন, মাথায় এ কলঙ্কের ডালি তুলিয়া দিবেন, কখন কল্পনাতেও একথা ভাবি নাই। ভগিনি! দেবরের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি জানি না, তিনি অভাগিনীর উপর কেন এরূপ বিরূপ হইলেন! অবাধে কলঙ্কিনী বলিয়া গালি দিলেন, আমি দুষ্টা আমার গৃহে স্থান হইতে পারে না! তেমন সরল—সদয়চিত্ত কিরূপে এরূপ মলিন হইল—কিরূপে এত কঠোর হইল বুঝিতে পারি না। গৃহে কন্যার স্থান হইবে, আমার হইবে না—বালিকা কিরূপে আমায় ছাড়িয়া থাকিবে তাই ভাবিতেছি!"

বসু। "দিদি! আমার কথা শুন, কোথায় যাইবে? আমাদের প্রাণ থাকিতে তোমায় অন্য কোথায় যাইতে দিতে পারিব না। এখন তাঁহার চিত্ত বিকৃত হইয়াছে, এক দিন অবশ্য অনুতপ্ত হইবেন, এক দিন অবশ্য তাহার দুষ্ক্রিয়া বুঝিতে পারিবেন, তখন আবার তোমার জন্য ব্যস্ত হইবেন, তোমার অপার স্নেহের কথা স্মরণ হইবে, তোমাকে আবার গৃহে লইয়া যাইবেন। যত দিন তাঁহার চিত্ত সংশোধিত না হয় তত দিন অভাগিনীর নিকটে থাকিতে দোষ কি?"

অপ। "ভগিনি! তোমার নিকট থাকিব তাহাতে দোষ কি? তবে এ পল্লীতে থাকিতে মন চাহে না, কলঙ্কিনী রূপে গৃহ বহিষ্কৃত হইয়াছি আবার কোন্ মুখে এ পল্লীতে থাকিব? ক্ষমা কর, সে অনুরোধ করিও না। এ পল্লী ত্যাগ সামান্যকথা, একবার ভাবিয়াছিলাম, এই সরোবরে এ জীবন ত্যাগ করিয়া কলঙ্কের ডালি নামাইব। কিন্তু পোড়া সন্তান সে সুখে বাদ সাধিয়াছে, আমি মরিলে সরসীর দশার কি হইবে, তাই এখনো এ পাপজীবন ধরিয়া আছি, আবার ভাবি—মনুষ্যজন্ম অমূল্য, বৃথা কলঙ্কাপবাদে এ জীবন নষ্ট করিব! আমি কে?—আমার জীবনে অধিকার কি? মাথার উপর এক জন নিয়ন্তা আছেন, তিনি জগতে বিধাতা, যাহা মঙ্গলময় তিনি সেই পথেই মানুষকে রাখিতেছেন, আমি ক্ষুদ্র কীট হইয়া তাঁহার কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কে?"

আকাশে মেঘ ছিল,—সেই সময়ে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। একটু জোরে বাতাস বহিল। বসুন্ধরা বলিলেন "দিদি! বৃষ্টি পড়িতেছে, বুঝি বা ঝড় উঠে আর এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে। আমরা ভিজি ক্ষতি নাই—সরসীর অসুখ শরীর—"

অপর্ণাদেবী বসুন্ধরার অঙ্ক হইতে সরসীকে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা বিশেষ রূপে আবৃত করিয়া রাখিলেন, সেই শীতল বাতাসে একটু গরম পাইয়া সরসী মাতৃক্রোড়ে গাঢ় নিদ্রিত হইল। অপর্ণা দেবী অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন—

"ভগিনি! দুঃখিনীর আর ঝড় বৃষ্টি! যাহারা পর্ব্বতে পাহাড়ে নিরাশ্রয়ে থাকে, তাদের যে দশা, তাহাদের সন্তানেরা তাহা দের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ কিসে হইবে? ভগিনি! কোথা যাইব? যাহার গৃহে স্থান নাই, তার আর স্থান কোথা? আমি যে সব থাকিতে কাঙ্গাল হইয়াছি—কাঙ্গালিনীর আর ঝড় বৃষ্টির ভয় কি?"

বসু। "দিদি! যাহারা পাহাড় পর্ব্বতে থাকে, তাহাদেরও ভগবান স্থান দিয়াছেন, আর তোমার স্থান হইবে না? কার ধনের তুমি প্রার্থী—তোমার সকলি, তুমি আপনার ভিটায় আপনি বাস করিবে, বামকান্ত কে? —তোমার স্বামীর সব তা' কেনা বলিবে?"

অপ। "সে কথা বলিও না, আমি কে? তিনি স্বামীর সহোদর, তিনি নন্ কে! আমি তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীমাত্র। তিনি তাঁহার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবেন তাহাতে আমি কথা কহিবার কে? তাঁহার অন্যায় দোষ দিব কেন—তিনি সরসীকে স্থান দিতে চাহেন,—আমারই কালমায়া সরসীকে ছাড়িতে চাহে না—আর সরসী শিশু, সেই বা কেমন করিয়া মা ছাড়িয়া

থাকিবে? সুতরাং আমার যে দশা তাহারও সেই দশা!"

বসুন্ধরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, বুঝিলেন অপর্ণাদেবী সাধারণ অশিক্ষিতা রমণীর মত সংকীর্ণমনা নহেন। রমণীর যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহার ছিল, নম্রতা সহিষ্ণুতা লজ্জাশীলতা ভিন্ন রমণীর আর সৌন্দর্য্য কোথায়?

বসুন্ধরা ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন,—"তবে একবার চল দিদি, কিরণের মার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এ কথা শুনিলে বউ মনে বড় আঘাত পাইবেন।"

অপ। "ভগিনী! তুমিই সব শুনিলে, আর তাঁহার শুনিয়া কায নাই। তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিও, আমি যেখানে থাকি সংবাদ দিব, কিরণকে মাঝে মাঝে যেন দেখিতে পাই।"

বসুন্ধরা অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন, 'দিদি! তুমি ত চলিলে, একবার কিরণকেও কি দেখিয়া যাইবে না?"

অপর্ণা দেবীরও নয়নে ধারা বহিল—কহিলেন, "কিরণকে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিব? সরসী যে কিরণের প্রাণ, সরসীকে না দেখিয়া কিরণই বা কেমন করিয়া থাকিবে?"

তখন বৃষ্টি একটু জোরে পড়িতে লাগিল। বসুন্ধরা কহিলেন,—"দিদি চল আর বিলম্ব করিও না, ক্রমে দুর্য্যোগ বাড়িতেছে, সরসী এখনি জাগিয়া উঠিবে। অনর্থক বৃষ্টি বাদলে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি দিদি! মেয়েটার অসুখ শরীর, কেন বৃষ্টিতে ভিজাইয়া তাহার অসুখ বৃদ্ধি করিবে? বড় শান্ত মেয়ে তাই এখনো কাঁদে নাই।"

অপর্ণা দেবী ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে কহিলেন,—

"চল, তাহাই করিব। কিরণকে দেখিয়া যাই যাইব। ভগিনি! ঝড়, বৃষ্টি, দুর্য্যোগ বলিয়া ভয় দেখাইতেছ। এখন শত শত দুর্য্যোগ মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে—অভাগিনী দুঃখ সহিবার জন্যই জন্মিয়াছে; স্বামী হারা হিন্দু রমণীর এইই সুখ।"

ব। "দিদি! আজ কদিন ত কিছুই আহার হয় নাই, বিশেষ আজ আবার একাদশী—মুখে এক বিন্দু জলও পড়ে নাই—আর শরীর এই শীর্ণ দুর্ব্বল—নিদেন আজি রাত্রি থাকিয়া কাল একটু কিছু মুখে দিয়া যথায় ইচ্ছা যাইও। এই দুর্য্যোগের রাত্রি; এই অবস্থায় কোথায় যাইবে?"

অ। "বসুন্ধরে! আমি পুরবধু, কখন রাজপথ লোকালয় কেমন দেখি নাই। কেমন করিয়া কাল দিবালোকে সকলের সম্মুখে পথ দিয়া যাইব। রাত্রি কালই উপযুক্ত সময়, তাহাতে আর বাধা দিও না। চল একবার বহুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই।"

"কোথায় যাওয়া স্থির করিলে?"

"বিধাতা যথায় মিলান!"

বসুন্ধরা ধীরে নয়ন জল মুছিলেন। তখন উভয়ে অজস্র বর্ষা এবং ঘোরতর ব্যাত্যা ভেদ করিয়া মৃদুপদ সঞ্চালনে গৃহাভিমুখিনী হইলেন। বাতাসের শব্দে সরসী উঠিয়া পড়িয়াছিল, একটু একটু গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতা বক্ষে চাপিয়া শীতল বায়ু হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেন,—কিন্তু সে বাতাস সে বৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। অপর্ণাদেবী ভগবানকে ডাকিয়া মনে মনে

করিতে লাগিলেন,—"হে অনাথের নাথ! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা—সম্পদে বিপদে তোমারই চরণ পূজা করিয়াছি—যেমন করিয়া রাখিবে—দাসী তাহাতেই সুখী। কেবল তুমি সহায় হইও—আর আমার কোন অভিলাষ নাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দশ বৎসর কাল কিরূপে কাটিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিব। সে কয়েক বৎসরে বড় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই বলিয়াই আমরা সে কথা দুই এক কথায় সারিয়া যাইব।

যে দিন আমরা নিশীথে অপর্ণা দেবীকে উদ্যানে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর দিন হইতে সে পল্লীতে তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। অবস্থান কালে কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহে নাই, যাইবার পর অনেকে অনেক কথা বলিল, অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিল, কেহ রামকান্তকে দোষিল, আবার কেহ তাঁহার সম্বন্ধে নানা সমালোচনা করিয়া নানা কাহিনী ফাঁদিল।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা সাতেও নাই পাঁচেও নাই, তাহারা কি আর রামকান্তের না হইয়া অনাথাবিধবার হইয়া দুই কথা বলিবেন? সুতরাং দিন কতক একটু গোলমালের পর সব চুপ চাপ হইয়া গেল। একরূপ তাঁহাকে সকলে ভুলিয়া গেল। অনাথা বিধবা একটা শিশু সন্তান লইয়া কোথায় রহিল—কি হইল—কেহ একবার সন্ধান ও লইল না; রামকান্তের এই যথেচ্ছাচারিতায় কেহ একটা কথাও কহিল না। দাস দাসী আত্মীয় পরিজন, যাহারা একদিন যাঁহার মুখ গম্ভীর দেখিলে প্রমাদ গণিত—ভীত, ব্যথিত, উৎকণ্ঠিত হইত—পরস্পরের কারণ জিজ্ঞাসার একটা ভীষণ গোল পড়িয়া যাইত—আজি তিনি কোথায়? যিনি হাসিলে, লোকে বিষণ্ণ থাকিলেও হাসিত—যিনি বিমর্ষ হইলে, একটা হাসির কথা উঠিলেও লোকে ভরসা পূরিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিত না—তিনি এখন কোথায়? কেহ কি একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছে? হায় জগৎ! তোমার উদরে কত অদ্ভুৎ লীলাই আছে।

সবলে ভুলিয়া গেল,—কিন্তু এক ঘর প্রতিবাসী ভুলিল না। যাইবার সময় কিরণের মাতা তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অপর্ণাদেবী রহিলেন না। তথাপি তাঁহারা মাঝে মাঝে তাঁহার সংবাদ লইতেন। অপর্ণা দেবীর বর্ত্তমান অবস্থাতে তাঁহারা অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহারা স্ত্রীলোক, আর কি করিবেন! কিরণ বড় হউক—জ্ঞান বুদ্ধি হউক, ঈশ্বর কূল দিবেন,—তখন দেখিব এ নিষ্ঠুরতার, এ অত্যাচারের দণ্ড আছে কিনা? চিত্ত যখন বড় ব্যথিত হইত—কিরণের মাতা এই রূপে আপনাকে প্রবোধ দিতেন। অপর্ণা দেবী কিরণকে বড় স্নেহ করিতেন; সুতরাং তিনি যথায় থাকিতেন, মাঝে মাঝে কিরণকে তথায় পাঠাইতে হইত। তাহাতে তাঁহার চিত্ত কতকটা শান্ত থাকিত।

প্রথমতঃ লোক দিয়া কিরণকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইত—তাহার পর, একটু বয়স্থ হইলে, সে আপনি যাইত আপনি আসিত। অল্প বয়সেই কিরণের বুদ্ধি বেশ বিকাশ পাইয়াছিল, মেধা প্রখর ও তেজস্বিনী ছিল - দেহের বাস্তি ও অবয়বের সৌষ্ঠবে, পঞ্চদশ বর্ষেই তাহাকে বিংশ বর্ষীয় যুবকের ন্যায় দেখা যাইত। পাঠে বিশেষ আস্থা ছিল। এই বয়সেই অনেক সদ্‌গুণের লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইত, -তাহাকে দেখিয়া মাতা আশ্বাসিত হইতেন, পিতৃস্বসার আনন্দের সীমা থাকিত না।

ধনি রামকান্তের পুরির অবস্থা সেই রূপই ছিল। তবে এই কয়েক বৎসরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পুরটী প্রায় বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, কন্যা নিও বিবাহোপযোগিনী হইল, সেই বর্ষে উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী দেখিয়া কন্যা ও পুত্রের বিবাহ দিলেন। অতি সমারোহের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু এই শুভ কার্য্যের সঙ্গেই পাঠককে একটা অশুভ সংবাদ দিতে হইল। সুষমার বিবাহ হইল বটে—কিন্তু সেই বর্ষেই অভাগীবালা বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আসিল। রামকান্ত কন্যাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, সুষমাকে অলঙ্কার খুলিতে দিলেন না; বলিলেন,—"বিধবা হউক, আমার ত আর স্নেহের হ্রাস হয় নাই, আমার সম্মুখে বিধবাবেশ দেখিতে পারিব না! আমার স্বর্ণলতা চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে মনের উল্লাসে থাকিবে—বিধবার বেশ তাহাকে কখন পাইতে দিব না।

গৃহিণীর মস্তক আরও উচ্চে উঠিল। বলিলেন, "এখনত বালিকাতার বিধবা বিবাহ হইতেছে, সুষমার বিবাহ দিলে হয় না? আমাদের অমতে কে কথা কহিবে? কাহার এত সাহস?"

কিন্তু একথায় কর্ত্তার তত মত হইল না—একেবারে সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিলেন না—অথচ শ্রীমতি গৃহিণীর কথায় স্পষ্ট 'না' ও বলিতে পারিলেন না। কথাটা একটু চাপা পড়িয়া গেল। গৃহিণী আর একটু চাপিয়া ধরিলে বোধ হয় হইয়া যাইত লোকাচার, দেশাচার, ধর্ম্মাচার গৃহিণীর কথায় কোথায় উড়িয়া যাইত। যাহা হউক সুখের মধ্যে সুষমার বিধবার মত কোন বেশই পরিবর্ত্তন করিতে হইল না, তাহার জীবন পূর্ব্বাপর স্বাভাবিক মত চলিতে লাগিল।

তাহার পর আরও দুই বৎসর কাটিল। সুষমা এখন প্রায় ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এ সময়ে সধবা থাকিলে, প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষে পড়িত। কিরণের বয়স এখন সপ্তদশ বর্ষ হইবে। কিন্তু অনেকে সে কথা বিশ্বাস করিত না - সে পূর্ণকায় যুবককে দেখিলে কে সপ্তদশ বর্ষীয় বালক বলিয়া অনুমান করিবে?

রামকান্ত এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন না। দুর্ব্বল বুঝিলেই তাহার বিষয় টুকু হস্তগত করা তাঁহার একরূপ অভ্যাস পাইয়াছিল। তিনি অধিকাংশ এদেশীয় জমীদারদিগের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এ বর্ষে বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। গৃহিণী সহসা একদিন বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। রামকান্ত বিচক্ষণ মন্ত্রী হারাইয়া বড় গোলে পড়িলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের অবস্থা এবং দুঃখের কথা

বুঝাইতে হইলে আমাদের ক্ষমতায় কুলাইবে না, সুতরাং সে কথা আমাদের মনে মনেই থাকুক।

পুত্র চারুচন্দ্র পিতার কার্য্যে বড় ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতেন, কিন্তু কখন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। সরসী ও সরসীর মাতার জন্য গোপনে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এমন কি পাঠের খরচ হইতে কিছু সাহায্য করিবার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কোন স্থানে তাঁহাদের সন্ধান পাইলেন না।

চারুচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতেন, সুতরাং তাঁহার সেই খানেই থাকিতে হইত। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বাটী আসিতে হইয়াছিল, আবার কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেলে, কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গেল। ক্রমশঃ

বাঙ্গালায় ব্যবসা বাণিজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। *)

আমাদের প্রস্তাবিত বাণিজ্য সমিতি এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ৬ লক্ষ টাকা মূলধনের আবশ্যক। তিনটি উপায়ে এই মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অর্থাৎ প্রথম, নিস্বার্থ দেশোপকারের জন্য আমাদের দেশের বড় মানুষেরা যদি এই টাকাটি দান করেন; দ্বিতীয়, ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে জয়েণ্টষ্টক প্রণালীতে ইহা উঠান; এবং তৃতীয়, দেশের ধনি দরিদ্র সকল লোকের নিকট হইতে ইহা ভিক্ষা করিয়া জমা করা।

আমাদের বিবেচনায় এই তিনটি উপায়ের একটিও আমাদের অসাধ্য নহে। নিস্বার্থ দেশোপকার করিব বলিয়া আমাদের দেশের দুইদশ জন বড় লোক অনায়াসেই এই টাকাটি দিতে পারেন। এরূপ দান তাঁহাদের অনভ্যস্ত নহে; উদারতায়, মহানুভবতায়, দেশহিতৈষীতায় এবং পরোপকারিতায় তাঁহারা কোন কালেই কম নহেন; তবে তাঁহাদের ধনাগারের উপর এত প্রকারের দাবি দাওয়া সদাসর্ব্বদা লম্বমান থাকে যে তাঁহারা সর্ব্বদা আপন বিবেচনা এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ীক কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আমরা বিবেচনা করি যে যদি আমাদের মধ্যে জন কতক ভাল লোক—যাঁহারা বিদ্বান বুদ্ধিমান গণ্য মান্য এবং যাঁহাদিগের উপর আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং বিশ্বাস আছে—দেশোপকার সম্বন্ধীয়

* ১৮ সংখ্যার ৫৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন প্রকার বৃহৎ প্রস্তাবের পৃষ্টপোষক হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থী হন, এবং তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে এক দিনে না হউক, এক বৎসরে না হউক, পাঁচ বৎসরেও যে ৬ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে না আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না।

তৎপরে দ্বিতীয় উপায়—ব্যবসায় করিবার অভিপ্রায়ে সকলে কিছু কিছু দিয়া ক্রমশঃ টাকাটি উঠান,—ইহাও আমরা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না। লাভের প্রত্যাশা যথেষ্ট আছে; তৎসঙ্গে দেশের উপকার হইবে এরূপ আত্ম প্রসাদের উত্তেজনা আছে। তাহা হইলে কেন যে টাকা উঠিবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দেশের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক, যাহাদের কথা উপরে বলিয়াছি, তাঁহারা আগ্রহাতিশয় দেখাইলে, নিজে যোগ দিয়া সাধারণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলে, সকলেই সহজে এবং স্বইচ্ছায় টাকা দিবে। বৃহৎকার্য্য এইরূপেই হয়, এবং এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই সমাজনেতাদিগের নামের স্বার্থকতা জন্মিয়া থাকে। ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকগুলি এরূপ লোক আজ কাল আমাদের মধ্যে হইয়াছেন; অকপট হৃদয়ে সম্পূর্ণ দীনতার সহিত আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেছি, আমরা কি তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিব না?

শেষ, তৃতীয় উপায়—অর্থাৎ ধনি দরিদ্র ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া আবশ্যকীয় টাকাটি সংগ্রহ করা। কিন্তু ইহাতেও আমাদের সমাজনেতাদিগের সাহায্য চাই। তাঁহারা আসুন, দল বাঁধুন, একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুণ, আপনাদিগের অভিপ্রায় উদ্দেশ্য এবং প্ল্যান সকলকে বিষদরূপে বুঝান; দেশের সকল সম্বাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করুন; স্থানে স্থানে মহতী সভা আহ্বান করিয়া আন্দোলন উত্থাপন করুন, যুবক দিগের উৎসাহের সহযতা গ্রহণ করুন; বৃদ্ধদিগের পরামর্শের প্রার্থী হউন, নিজে কেহ কেহ আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া এই মহৎ উদ্দেশ্যকে জীবনের সারপদার্থ করুন, মনের একাগ্রতা দেখান, ইচ্ছার তীব্রতা প্রকাশ করুন, দেখুন দেখি, তাহা হইলে এই কার্য্য হইয়া যায় কিনা?

প্রধান কথা এই যে আমাদের প্রস্তাব এবং উদ্দেশ্য কি তাহা দেশের লোককে, বিশেষতঃ শিক্ষিত লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। ধনির দ্বারায়ত আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইবই হইব, কিন্তু নির্ধন শিক্ষিত লোকেরাও ইচ্ছা করিলে আমাদের কম সাহায্য করিতে পারেন না। আমরা বিবেচনা করি যে তাঁহারা আমাদের একটি প্রধান সহায় এবং অবলম্বন হইতে পারেন, যদি আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের কথাটা, উদ্দেশ্যটা, অভিপ্রায়টা একবার বুঝাইতে পারি। তাঁহারা সংখ্যায় অনেক, কিছু কিছু করিয়া অবহেলা করিয়াও যদি তাঁহারা ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের "রাই কুড়াইয়া বেল" হইয়া যাইবে। আর তাঁহারা শিক্ষিত; তাঁহাদের হৃদয় মন সর্ব্বদাই দেশোপকার সংসৃষ্ট সকল প্রকার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; এবং তাঁহারা দুষ্প্রাপ্যও নহেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করি-

বার জন্য উপসনা করিতে হইবে না। আমরা যদি একটু চেষ্টা করিতে পারি, একটু তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে আমাদের কথাটা প্রবেশ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই সহজে পূর্ণমাত্রায় আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া যাইবে।

নির্ধন এবং নিঃস্ব শিক্ষিতেরা, যাঁহাদেরই জন্য আমরা টাকা সংগ্রহের পরামর্শ করিতেছি, তাঁহারাই আবার আমাদিগকে কি করিয়া টাকা দিবেন, ইহা বড় বিচিত্র কথা। কিন্তু আমরা বলি, না বুঝিলে সবই বিচিত্র কথা, আর বুঝিলে কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকার দ্বারা আমাদের কথা বুঝাইতেছি।

মনে কর, বাঙ্গালায় (সমগ্র ভারতবর্ষের কথা এখন ছাড়িয়া দেও) শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত? ঠিক সংখ্যা নিরাকরণ করা বড় কঠিন কথা। কিন্তু আমরা একটা হিসাব লইতেছি। সে হিসাব এই যে প্রায় গত ২৫ বৎসর হইতে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ইদানীং প্রতি বৎসর ২।২॥ হাজার করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ হইতেছে; পূর্ব্বে মুরু মুরু অবশ্য এত সংখ্যা পাশ হইত না। সেই জন্য আমরা বৎসরে গড়ে এক হাজার লইতেছি। তাহা হইলে মোট সংখ্যা ২৫ হাজার হইল। কিন্তু এই ২৫ হাজারের মধ্যে অবশ্য আজ পর্য্যন্ত সকলে জীবিত নাই—অন্ততঃ এক চতুর্থাংশও গত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা একেবারে অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২ হাজার ধরিয়া লইতেছি। এতদ্ভিন্ন, এণ্ট্রান্স পাশ করেন নাই, এমনও বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোক আমাদের দেশে আছেন। এত চাকুরে লোক, কিন্তু একটি অফিস খুঁজিয়া দেখিলে তন্মধ্যে এক চতুর্থাংশও এণ্ট্রান্স পাশওয়ালা লোক পাওয়া যায় না। অতএব এণ্ট্রান্স পাশওয়ালা যদি ১২ হাজার হয়েন তাহা হইলে বিনা পাশওয়ালা তদপেক্ষা বেশী সংখ্যক হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা হউক বেশী না ধরিয়া আমরা উভয়েরই সংখ্যা সমান করিয়া লইলাম। অর্থাৎ ঠিক করিয়া লইলাম যে উপস্থিত বাঙ্গালার মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অন্যূন ২৫ হাজার। এই ২৫ হাজার লোক কেহই বসিয়া নাই—কোন না কোন প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এবং অল্প বিস্তর সকলেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন। যদি বল, সকলের কি চাকরি আছে? তাহা যদি থাকিত, তবে আর এত "হা—মা—কা" শব্দ কেন? আচ্ছা সে কথাও মানিলাম—এ সংখ্যার মধ্যেও পাঁচ হাজার কম করিলাম। সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে ২০ হাজার উপার্জ্জনকারী শিক্ষিত লোক আছেন একথা আর বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। আচ্ছা এক্ষণে মনে কর, যদি এই বিংশতি সহস্র লোক দেশোপকারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে মাসিক এক টাকা করিয়া দান করেন, তাহা হইলে কত দিনে ৬ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে?

২০ হাজার লোক মাসে—২০ হাজার টাকা
১বৎসরে হইবে (২০ × ১২)—২লক্ষ ৪০হাজার
৫ বৎসরে হইবে (২৪০ × ৫)—১২ লক্ষ টাকা।

সমস্ত শিক্ষিত লোক মাসিক এক টাকা করিয়া দান করিলে পাঁচ বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে। কিন্তু তত আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহার অর্দ্ধেক প্রয়োজন। তাহা হইলে

মাসিক ॥০ আনা করিয়া লইলে ৫ বৎসরের ভিতর আমাদের আবশ্যকীয় টাকাটি উঠিয়া যাইতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, ইহার মধ্যে কি বিচিত্র কিছু আছে?

উত্তর এই হইতে পারে যে, বিচিত্র আছে বৈ কি? কাগজে কলমে অতি পরিষ্কার হিসাব বুঝা গেল, কিন্তু দেশ দেশান্তর বিক্ষিপ্ত এই বিংশতি সহস্র লোকের নিকট মাসে ॥০ আনা করিয়া উঠায় কে? তাহা কি সম্ভব? এস্থানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। একজন লোকের একটি পুত্রের সর্পাঘাত হইয়াছিল, লোকটি শোকে দুঃখে অস্থির, পরিবারস্থ সকলেও হাহাকার করিতেছে। এমন সময়ে সেস্থানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখস্থ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সে গম্ভীর ভাবে বলিল "সাপে কামড়াইয়াছে, তার আর ভয় কি? আমি আরাম করিয়া দিব। শীঘ্র আমাকে একথালা ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া দেও।" পুত্রের পিতা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, তাড়াতাড়ি ভক্তি ভাবে সন্ন্যাসীর জন্য ভাত আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী পরম পরিতোষের সহিত আহার করিয়া বলিলেন, (তাঁহার গাম্ভীর্য্য বরাবর সমভাবেই আছে) যে একটা গাছপাকা টাটকা তাল লইয়া আইস। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই শিরোধার্য্য, পাঁচটা লোক পাঁচদিকে দৌড়াইয়া পাকা তাল লইয়া হাজির হইল। সন্ন্যাসী তখন পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে "এক কায কর, ঐ তালটা ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যে যে কয়টা আঁটি থাকে তাহা এক একটি করিয়া ছেলেটিকে খাওয়াইয়া দেও।" সকলে শুনিয়া অবাক! একে ছেলে মানুষ, তাহাতে মৃতবৎ, আস্ত তালের আঁটি কি করিয়া গলধঃকরণ করিবে। তাহারা বলিল "সে কি ঠাকুর। আস্ত আঁটি কি করিয়া গিলাইয়া দিব?" সন্ন্যাসী তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল "তবে আর আমি কি করিব?" আমাদের ভয় হইতেছে, যে আমাদের টাকা উঠাইবার হিসাব টা দেখিয়া পাঠক বর্গ আমাদিগকে উপরোক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় না ভাবেন। অর্থাৎ পরিষ্কার হিসাব দেখাইয়া দিলাম, যদি তোমরা না উঠাইতে পার, তবে আমরা নাচার।

আমাদের কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ অভিপ্রায় নহে। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বিজ্ঞ সাধারণ সমক্ষে একটা নূতন রকমের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া নাম কিনিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। আমাদের হৃদয়ের যে অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং সংস্কার তাহাই "যেন তেন প্রকারেণ" প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের সহস্র সহস্র অনুরোধ যে সাধারণে আমাদের প্রস্তাবটি আপনাদিগের বিবেচনাধীন করিবেন। দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য নাই; চাকুরি যাহা ছিল শেষ হইয়াছে—বেলই বা আর কত খুলিবে? কিন্তু এদিকে বৎসর বৎসর দ্বি-সহস্রাধিক যুবা পুরুষ শিক্ষা সমাপ্তি করিয়া উপার্জ্জনাকাঙ্ক্ষায় সমাজে উপস্থিত হইতেছে। এক দিকে নির্ম্মম বিদেশীয় রাজা অর্থ শোষণ করিতেছেন, অন্য দিকে বিদেশীয় বণিকেরা ব্যবহারীয় সমস্ত দ্রব্যাদি, এমন কি সামান্য তৈজস পত্র পর্য্যন্ত নিজের দেশ হইতে যোগাইয়া যাহা কিছু ঘরে আছে তাহা আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী নিঃসহায় লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে.—কি করিয়া

ইহারা খাইবে, কি করিয়া ইহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারের। প্রতিপালিত হইবে, তাহা ঈশ্বরই অবগত আছেন। দেশের রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন; ক্রোর ক্রোর টাকা উঠাইতেছেন, কিন্তু এক সৈন্য রক্ষা করিতে আর বিদেশীয় কর্ম্মচারী দিগের বেতন দিতে সে সমস্ত দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইতেছে! রাজার রাজনীতি যে পরিবর্ত্তিত হইবে, মমতাশূন্য বিজাতীয় রাজা যে কৃপাচক্ষে আমাদিগের উপর দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহার সাহায্যে সর্ব্বতোভাবে যে আমরা উন্নীত হইতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা কিম্বা আশা নাই। যেমন চলিতেছে, এতদিন চলিয়া আসিতেছে, তেমনই চলিবে; এবং যেরূপ প্রতিদিন নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর অবস্থায় আমরা অবনিত হইতেছি, তাহাই হইতে থাকিব; কিন্তু বল দেখি, এরূপ ভাবে চলিলে আর কত দিন আমরা টেঁকিব? একপক্ষে হুহুশব্দে লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, অপর পক্ষে জীবনোপায়ের সকল প্রকার রাস্তা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। দুর্ভীক্ষ দেখা দিয়াছে,—এমন কোন বৎসর কাটিতেছে যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এক না এক প্রদেশে দুর্ভীক্ষ হইতেছে না? তবে বল দেখি, এমন অবস্থায় কি আর আমাদের চুপ করিয়া থাকা উচিত? আমরা বুঝিতেছি, যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি এবং সমধিক প্রচার না করিতে পারিলে আর আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই; আরও বুঝিতেছি যে, যে ব্যবসায়বাণিজ্য এখন আছে তাহা কিছুই নহে—কেবলমাত্র অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত লোকের দ্বারা কৃত বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বর্জ্জিত; আরও বুঝিতেছি যে আমাদের শিক্ষিত লোকদিগকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে না পারিলে আর এ শোচনীয় অবস্থা দূরীভূত হইবে না। এই সমস্ত বুঝিয়া কি আর আমাদের চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত? কখনই নহে।

আমাদের এক্ষণে নিজের চেষ্টা এবং উদ্যমের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা উচিত। ৬ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া উঠিবে না, এমন বৃহৎ কার্য্য আমরা করিতে পারিব না, একথা সহজে বলিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু এরূপ "না" বলা অভ্যাস থাকিলে কোন জাতিই জগতে মস্তকোত্তলন করিতে পারে না। আমরাও পারিব না। বিংশতি সহস্র লোককে কোন বিষয়বিশেষে একস্বার্থাপন্ন করা বড় কঠিন কার্য্য তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আলস্যজড়িত হাঁই তুলিতে তুলিতে যদি 'বিং-শ-তি স হ-স্র কথাটা চিন্তা করা যায় তাহা হইলে ব্যাপারটা যেরূপ কঠিন বলিয়া বোধ হয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। কোন সমাজবিশেষে যখন কোন একটী বৃহৎ জাতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তখন সে সমাজস্থ সকল ব্যক্তিই যে তাহা বুঝে তাহা নহে; জনকতক লোক, গণ্য মান্য বিদ্বান বুদ্ধিমান শত কিম্বা সহস্র লোক তাহা বুঝিতে পারে এবং আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহা করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের উৎসাহ, আত্মত্যাগ, স্বার্থবন্ধন অসমসাহসিকতা, দেশহিতৈষীতা তখন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া পড়ে, এবং সংক্রামক

রোগের ন্যায় তাহা সাধারণ সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমেরিক সমরের প্রারম্ভে ইংরাজেরা তথায় পরিধেয় বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিলেন—তদ্দেশবাসীদিগকে আপন আয়ত্ত মধ্যে লইয়া আসিবার জন্য। দেশের মধ্যে দুই দশজন স্বদেশবৎসলা রমণী প্রচার করিলেন যে কোন চিন্তা নাই, ইংলণ্ড হইতে যদি বস্ত্র না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমরা আমেরিক রমণীরা—স্বহস্তে বস্ত্র বয়ন করিব। অবশ্য সমস্ত আমেরিকান রমণীরা বিচলিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু আবশ্যক হইলে করিতেও পারিতেন না, কিন্তু উৎসাহ এবং নিস্বার্থ দেশোপকার এমনি সংক্রামক জিনিস যে কয়েটীমাত্র রমণীর কথাতে সমস্ত দেশ মাতিয়া উঠিল। সকলের হৃদয়ে বল হইল, সকলেই দেশের স্বাধীনতালাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। জগতের ইতিহাসে এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিধর্ম্মী মুসলমান সাক্রোশে চিতোরনগরী অবরোধ করিয়াছে, উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। মুসলমানের লোকবল বেশী, রাজপুতেরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। অস্ত্র শস্ত্র গোলা গুলি ধনুর্ব্বাণ সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া আসিল—কি করিবা আর শত্রুর দারুণ আক্রমণ সহ্য করা যায়? এমন দুঃসময়ে দুই দশজন স্বদেশবৎসলা রাজপুত রমণী সৌন্দর্য্যের সার আপন আপন কেশ পাশ স্বহস্তে কাটিয়া ধনুকের ছিলা করিতে দিলেন, এবং বন্দুকের গুলি করিতে গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিলেন। স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা রমণীর এরূপ আত্মত্যাগ, এত স্বদেশবাৎসল্য? এই স্বর্গীয়ভাব—ইহার কথা প্রচার হইবামাত্র সমস্ত নগরীতে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সকল ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া দ্বার ছাড়িয়া, আপনাপন কার্য্য ছাড়িয়া, আসিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। সে ভয়ানক, অসাধারণ, অপরিসীম, দুর্জ্জয় জাতীয় উৎসাহের আগে কি আর কিছু তিষ্ঠিতে পারে? কোথায় লাগে মুসলমান আর তাহার অগণ্য সেনা? অচিরে অবরোধ উঠাইয়া তাহাদিগকে পলায়ন করিতে হইল।

দেশের মধ্যে কোন বৃহৎ কার্য্য হইতে হইলে এইরূপেই হইয়া থাকে, এবং আমাদের দেশেও যদি কখন কিছু হয় তাহা হইলে এই রূপেই হইবে—অন্য উপায় নাই। টাকা জমাইয়া একটি সাধারণসমিতি স্থাপিত করিয়া দেশের মধ্যে আমাদিগকে ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রচার করিতে হইবে; যতক্ষণ আমাদের মধ্যে দুই দশজন ভাল লোক সম্পূর্ণরূপে আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া ইহা করিতে প্রস্তুত না হইবেন, ততক্ষণ কিছুতেই হইবে না।